
অভীক সরকার

পেতবত্থু

অভীক সরকার

পেতবত্থু



পত্র ভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ পয়লা বৈশাখ ১৪২৭। এপ্রিল ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০২০
তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

PETBOTTHU
Thriller Fiction by Avik Sarkar
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones +91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-626-7

আমার ছোটবেলার ইস্কুল,
আমার মায়াবেলার গাছকোটর শিবপুর
শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের
সেই সমস্ত শিক্ষকদের,
যাঁদের পায়ের কাছে বসে
অনেক কিছু শেখার ছিল,
কিন্তু কিছুই শিখে উঠতে পারিনি।

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ

কৈফিয়ত

আজ থেকে বছর দুয়েক আগেকার কথা। জনৈক বাংলা টিভি চ্যানেলের কর্তাব্যক্তিরা আমার কাছে আসেন টাইম ট্রাভেল বা প্যারালাল ইউনিভার্স নিয়ে ওয়েব সিরিজের উপযুক্ত একটি গল্প লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। প্রস্তাবটি শুনে ভারী উৎসাহিত বোধ করি। তার কারণ, যৌবনের প্রারম্ভে পপুলার সায়েন্স নিয়ে সবিশেষ আগ্রহী ছিলাম। স্টিফেন হকিং বা কার্ল সাগানকে মনে হতো ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বরপুত্র। পথিক গুহ'র প্রায় কোনও লেখাই ছাড়তাম না। ফলে সেই বিষয় নিয়ে লেখার প্রস্তাব এলে পুলকিত হওয়ার কারণ থাকে বইকি!

কিন্তু সে তো আগেকার কথা। এরমধ্যেই বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অনেকখানি। তাই পুরোনো বইপত্র ঝেড়েঝুড়ে নামাতে হল। স্কুল কলেজের ভুলে যাওয়া বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যও নিতে হল অনেক। ফেসবুক সূত্রে আলাপ হয়েছিল বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পার্থ ঘোষের সঙ্গে। পার্থদা প্রচুর তথ্য দিয়ে অনেক সাহায্য করলেন, এমনকী লেখার খানিকটা পড়ে কিছু পরামর্শও দিলেন।

কিন্তু এতসবের পরে যখন লেখা তৈরি, তখন জানা গেল সেই কর্তাব্যক্তিরা চাকরি ছেড়ে অন্যত্র বাসা বেঁধেছেন। অতঃকিম? লেখাটা তখনকার মতো ধামাচাপা রইল।

এর বছরখানেক পরে আমি এবং আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু পাবলিকেশন শুরু করি। প্রথমেই ঠিক হয় যে দু'হাজার উনিশ সালের দুর্গাপূজার সময়ে আমাদের প্রকাশনা থেকে একটি পূজাবার্ষিকী সংখ্যা বেরোবে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে তার জন্য একটি উপন্যাস লিখে দেওয়ার। সেই সঙ্গে সম্পাদকদের কড়া আদেশ ছিল উপন্যাসটি আগমবাগীশ সিরিজের হতেই হবে।

সেই দিনই আমি পেতবখুর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ছকে ফেলি। ইতিমধ্যেই আমি দেবী ছিন্নমস্তা এবং দেবী মাতঙ্গীকে নিয়ে দুটি কাহিনি লিখে ফেলেছি। কাহিনিদুটি পাঠকমহলে সমাদৃতও হয়েছে। সেই সূত্রেই মাথায় এল দশমহাবিদ্যা'র সবচেয়ে বিখ্যাততম দেবী কালী'র কথা। দেবী কালী শুধু যে কৈবল্যদায়িনী তাই নন, তিনি সময় তথা কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বটে। মহানির্বাণতন্ত্রমতে শিব জগতের সকল প্রাণীকে কলন বা গ্রাস করেন বলেই তিনি মহাকাল। আর এই মহাকালকেও যিনি গ্রাস করেন, তিনিই মহাকালী।

কাল সংগ্রহণাৎকালী সর্বেষমোদিরূপিনী।
কালত্বাদাদি ভূতত্বাদাদ্যাকালীতি গীয়সে।

ভয়ের আড়ালে তিনিই অভয়া, কালগ্রাসের মধ্যে তিনিই অনন্তজীবন, মৃত্যুর মধ্যে তিনিই অমৃতস্বরূপিনী।

ঠিক করলাম দেবী মহাকালীকে নিয়েই বাঁধব আমার পরের গল্প। প্রেক্ষাপটে থাকুক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সময়বিকলন। সঙ্গে জুড়ে দিই আমার সেই পূর্বলিখিত টাইম ট্রাভেলের গল্পটি। সময়ের ঘেরাটোপ ছিঁড়ে বেঁচে উঠুক এক বন্ধুর প্রতি আরেক বন্ধুর ভালোবাসার গল্প, পোষ্য প্রাণীটির প্রতি এক সর্বহারা যুবকের অনিঃশেষ ভালোবাসার কাহিনি, পিতৃস্নেহবঞ্চিত এক যুবকের বাবাকে ফিরে পাওয়ার মায়াময় আখ্যান।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তার কপালে বেশ কিছু প্রশংসাবাক্য জোটে। বলাবাহুল্য, এর পেছনে সম্পাদক ঋজু গাঙ্গুলীর কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে, এবং প্রচুর মাজাঘষা করে উপন্যাসটিকে তিনি যথেষ্ট গতিশীল করে তোলেন। ইত্যবসরে পত্রভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে ফোন করে বলেন যে উপন্যাসটি তিনি বই হিসেবে প্রকাশ করতে চান, কিন্তু বর্ধিত আকারে।

একদিন পত্রভারতীর অফিসে সেই নিয়ে একটি ছোটখাটো মিটিংও হয়ে যায়, গল্পের খামতিগুলো উনি মার্ক করে দেন। তাঁর আদেশ মেনেই গল্পের প্রয়োজনে আবির্ভাব ঘটে দুটি নতুন চরিত্রের। লোবসাং

গিয়াৎসো এবং মেজর রাহুল মাত্রে! উনিশ হাজারি উপন্যাসটি আড়ে বহরে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজারে।

আপাতত সেই পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত 'পেতবত্থু' আপনাদের সামনে। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি পড়ে এবং মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন শ্রীমতী অনুষ্টুপ শেঠ, শ্রীময়ী মৌপিয়ালি দে সরকার এবং শ্রীময়ী তমশ্রী মণ্ডল। উপন্যাসটির ভালোমন্দের সমস্ত দায় এই মহিয়সীত্রয়ীর। আমি আপাতত কালীনামহ্রদে জীবন ভাসিয়েছি। নাম অনামের দায় তাঁর, আমি কেবলমাত্র লিখেই খালাস।

অভীক সরকার

কলকাতা, গোরাবাজার
দোলযাত্রা। ৯ই মার্চ। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ



প্রাককথন

ঘরের মধ্যে কোনো জানলা নেই। দেওয়াল, মেঝে, সিলিং সবই কাঠের। আসবাবপত্র বলতে দেওয়ালজোড়া ছোট-ছোট খোপ, ব্যাঙ্কের লকারের মতো। মাঝখানে একটা পালিশ-করা সেগুনকাঠের বড় টেবিল। টেবিলের দু'দিকে দুটো চেয়ার। মাথার ওপর বড়-বড় লাইট জ্বলছে। উজ্জ্বল হলেও সে আলোর কোনো তাপ নেই।

চেয়ারে দুজন মানুষ মুখোমুখি বসেছিলেন। টেবিলের ওপর রাখা একটি অতি জরাজীর্ণ পুঁথি। হাত দিয়ে তুলতে গেলে পাতা খসে পড়ে যেতে পারে, এমনই ঝুরঝুরে অবস্থা তার।

'কিছু বোঝা গেল পুঁথিটা থেকে?' প্রশ্ন করলেন একজন। তাঁর ছোটখাটো চেহারার মধ্যে নজরে পড়ে অত্যুজ্জ্বল চোখদু'টি।

'হুঁ, মনে হয় বুঝতে পেরেছি চিফ।' উত্তর দিলেন অন্যজন। পুঁথিটা তাঁর সামনেই খোলা।

'এনিথিং সিরিয়াস?' প্রশ্ন করলেন চিফ, 'অনুবাদক তো এর মানেই বুঝতে পারছে না। বলছে কথাগুলো অদ্ভুতুড়ে, অর্থহীন। কোনো মানেই হয় না তাদের।'

স্মিত হাসলেন অন্যজন, 'আছে চিফ, গভীর অর্থ আছে। সে অর্থ এতই গূঢ় যে তাকে গোপন করার জন্য এই হেঁয়ালিভরা সাংকেতিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অনধিকারীদের নিরুৎসাহ করাই এর উদ্দেশ্য।'

'কিন্তু কেন? এমনকী লেখা আছে ওখানে?' ধারালো শোনায় চিফের গলা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খোলেন তিনি। পরের পনেরো মিনিট ধরে একটানা বলে যান। চিফ কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুনে যান।

'আপনার কী মনে হয়, এসব সত্যিই কি ঘটতে পারে?' তাঁর বলা শেষ হলে প্রশ্ন করেন চিফ।

'ঘটতে পারে নয় চিফ, ঘটতে চলেছে।' শান্তস্বরে বলেন তিনি, 'ভুলে যাবেন না, যিনি এই পুঁথি লিখে গেছেন তাঁর তুল্য প্রতিভাবান তন্ত্রবিদ এই পৃথিবীতে আজও জন্মাননি। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হতেই পারে না।'

একটু চুপ করে থাকেন চিফ, তারপর বলেন, 'যদি ধরেও নিই যে ঘটনাটা ঘটবে, যার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, সেটা কখন আর কোথায় ঘটবে সে ব্যাপারে কিছু বলা আছে?'

'আছে চিফ। যে গ্রহ ও নক্ষত্রের সন্নিবেশের কথা তিনি বলে গেছেন, তার ভিত্তিতে গণনা করে দেখেছি যে আর বেশি দেরি নেই। আগামী সপ্তাহেই ঘটতে চলেছে সেটি।'

'কোথায় জায়গাটা? ম্যাপে দেখাতে পারবেন?' এই বলে হাতে ধরা একটা ট্যাবে এশিয়ার ম্যাপ বার করে তাঁর সামনে ধরেন চিফ।

দুটো দীর্ঘ আঙুল খেলে গেল ট্যাবের স্ক্রিনের ওপর। ম্যাপ এদিক-ওদিক সরিয়ে, খানিক ছোটবড় করে এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন তিনি। সেদিকে তাকিয়ে খানিক চিন্তিত দেখায় চিফকে। অস্ফুটে বলেন, 'দিস ইজ দ্য সেম প্লেস হোয়্যার উই আর গোইং টু কন্ডাক্ট সামথিং ভেরি সিরিয়াস নেক্সট উইক। দুটো একই জায়গায়? এত কো ইনসিডেন্স? স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এরকম সমাপতন তো স্বাভাবিক না! আই অ্যাম হ্যাভিং এ ভেরি ন্যাস্টি ফিলিং অ্যাবাউট ইট।'

উঠে দাঁড়ান চিফ। অন্যজনের হাতটা চেপে ধরে বলেন, 'আমি এসব তন্ত্রমন্ত্রে একেবারেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু সতর্কতা হিসেবে যদি আপনাকে ওখানে গিয়ে একটু নজরদারি করতে বলি, সেটা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কি?'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন অন্য মানুষটিও, বললেন, 'আপনি না বললেও আমাকে ওখানে যেতেই হত চিফ। আমার মনে হচ্ছে একটা মহাদুর্যোগ আসন্ন।'

দেড়হাজার বছর আগে

রাতে শুতে যাওয়ার সময়েই একটা খড়খড় আওয়াজ পেয়েছিল থুবতেন। শুকনো ডালপালার ওপর কেউ হেঁটে গেলে যেমন আওয়াজ হয় তেমন। কিন্তু তখন সেটাকে বিশেষ আমল দেয়নি। অবশ্য আমল দেওয়ার মতো শরীরের অবস্থাও ছিল না তার।

তিব্বতের এই ইয়াদং উপত্যকাটা উত্তরদিকের তুলনায় একটু বেশি সবুজ। একদিক দিয়ে বয়ে গেছে নিয়াংচু নদী, আরেকদিকে সিসামাংপা পর্বতশৃঙ্গ। নিয়াংচু-র তীরে বড় ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সেখানেই ইয়াক চরাতে যায় থুবতেন। অবশ্য নিজের ইয়াক নয়, ওয়াংচুকের ইয়াক।

ওয়াংচুক শুধু এই গাঁয়ের মোড়লই নয়, বেজায় বড়লোক আর ক্ষমতাশালীও বটে। তিব্বতের রাজা ঠ্রিসং দেচেন-এর মহামন্ত্রী হলেন গিয়ে মাশাং, রাজার থেকে তাঁর ক্ষমতা কম কিছু নয়। ওয়াংচুক তারই তুতো ভাই, পোতালা প্রাসাদে প্রায়ই যাতায়াত আছে। পুরো শিগাৎসে অঞ্চল তার হাতের মুঠোয়। তার নজর এড়িয়ে একটা খচ্চরও মানজ্বালা, মানে পাহাড়ের ওপারের দেশে যেতে পারে না।

বছরের এই সময়টায় সারা ইয়াদং অঞ্চল জুড়েই রাতের দিকে একটা প্রবল উত্তুরে হাওয়া বয়। থুবতেন ভাবল হয়তো সেই হাওয়াতেই কাছেপিঠে কোথাও একটা ডালপালা খসেটসে পড়েছে। একেই এই অঞ্চলে রাতের বেলা উঠে এদিক-ওদিক দেখতে যাওয়াটা নেহাতই নির্বুদ্ধিতার কাজ, তাছাড়া আজ রাতে তার বাইরে না বেরোনোর আরও একটা কারণ আছে।

সারাদিন ধরে শিনজেকে খুঁজে খুঁজে খুব পরিশ্রান্ত সে। শিনজে হারিয়ে গেছে।

শিনজে হল থুবতেনের পোষা দ্রোক-খি। তিব্বতের পার্বত্য উপত্যকায় সিংহের মতো কেশরওয়ালা যে বিশাল আকারের লোমশ কুকুরগুলো ঘুরে বেড়ায়, তাদেরই একজন। কয়েকবছর আগে কাঠ কাটতে গিয়ে জঙ্গলের ধারে একে কুড়িয়ে পেয়েছিল থুবতেন। পাশেই বাচ্চাটার মায়ের চিতায় খাওয়া শরীরটা পড়েছিল। বাচ্চাটা কুঁই-কুঁই করে কাঁদছে দেখে থুবতেনের ভারি মায়া হয়, কোলে করে ঘরে নিয়ে আসে তাকে।

তারপর থেকে শিনজে তার সঙ্গেই আছে।

একা মানুষ থুবতেন, শিশুবয়সেই বাবা তাকে আর মা-কে ছেড়ে চলে যান। তার বছরখানেকের মধ্যেই থুবতেনের মা জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে চিতার পেটে যাওয়ার পর না খেয়ে প্রায় মরার উপক্রম হয়েছিল তার।

সেই থেকে প্রতিবেশীদের দয়াদাক্ষিণ্যেই মানুষ থুবতেন। তাই শিনজের প্রতি এত মায়া তার। শিনজে ছাড়া তার কেউ নেই, সে ছাড়া শিনজেরও কেউ নেই।

সারাদিন ইয়াক চরিয়ে আর ওয়াংচুকের বাড়ির ফাইফরমাশ খেটে এক গামলা যবের চমবা অথবা মাংসের খণ্ড যাই পায়, শিনজের সঙ্গে ভাগ করে খায় সে।

বাড়তে বাড়তে এখন শিনজে আকারে-প্রকারে প্রায় সিংহের মতোই বড়সড়। সারা শরীরে কুচকুচে কালো লোম, মাথা ভরতি কেশর, বড় থালার মতো থ্যাবড়া মুখ, আর উচ্চতায় প্রায় থুবতেনের কোমরের কাছাকাছি। শিনজেকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলে অন্য কুকুর কেন, গ্রামের মানুষজনও সভয়ে পথের ধার ঘেঁষে হাঁটে। দ্রোক-খি এদিকটায় অনেকের বাড়িতেই আছে, কিন্তু শিনজের মতো অমন কুচকুচে কালো রোমওয়ালা বিশাল শরীরের কুকুর এই তল্লাটে আর কারও নেই।

আজ সকালে উঠে থেকে শিনজেকে দেখতে পায়নি থুবতেন। প্রথমে ভেবেছিল, এদিক-ওদিক ঘুরতে গেছে, তারপর বেলা বাড়তে চিন্তা হতে থাকে তার। এতক্ষণ বাড়ির বাইরে কখনোই থাকে না শিনজে। গেল কোথায় সে?

সেই থেকে আজ সারাদিন ধরে শিনজেকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছে থুবতেন। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে অন্ধকার নেমে আসা অবধি সমস্ত গ্রাম, পাহাড়ের কোলের জঙ্গল, সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেছে সে। তার

পর ক্লান্ত অভুক্ত অবস্থায় ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরেছে। তার শরীরে আজ আর একফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই।

ঘুমটা আসি-আসি করছে, এমন সময় ফের সেই খড়খড়ে আওয়াজটা কানে এল। আওয়াজটাকে আমল না দিয়ে ফের শোয়ার উদ্যোগ করতেই একটা চাপা ভুক-ভুক ডাক যেন ভেসে এল কোথা থেকে। তারপর একটা ক্ষীণস্বরে গররর করে ডেকে উঠল একটা কুকুর।

শিনজের গলা না?

খানিকক্ষণ কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল থুবতেন। এই আওয়াজ কিছুতেই ভুল করতে পারে না সে। রাগে আর ক্ষোভে মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল তার। শয়তানটা ফিরে এসেছে তাহলে? কাল সকালে হতচ্ছাড়াটাকে আচ্ছা করে যদি না পিটিয়েছে তবে তার নাম থুবতেন নয়, বিড়বিড় করে শপথ নিল সে। বড্ড বাড় বেড়েছে হতচ্ছাড়ার। তার ওপর আবার নির্লজ্জের মতো ভুক-ভুক করে ডাকা হচ্ছে। এই ডাকের মানে বিলক্ষণ জানে থুবতেন, শিনজে মৃদুস্বরে বাইরে ডাকছে তাকে।

তবে রে শয়তান, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! চোয়াল শক্ত করে কোনোমতে উঠে কাঠের দরজাটা আস্তে করে খুলে বাইরের দিকে তাকাল থুবতেন।

অমাবস্যার ঘন অন্ধকার রাত। শীতের শুরু, আকাশ একেবারে পরিষ্কার থাকে এখন। তবু তারার মিটিমিটি আলোয় খুব অল্পই দেখতে পাচ্ছিল থুবতেন। কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করে সে, আওয়াজটা এল কোথা থেকে?

হাতের লাঠিটা নিয়ে বাইরে এল থুবতেন।

আশেপাশের সবকিছুই চুপচাপ। থুবতেনের বাড়িটা ঠিক গ্রামের মধ্যে নয়, একটু একটেরে, জঙ্গলের গা ঘেঁষে। ভাঙাচোরা কাঠের বাড়িটার একদিকে দ্রোমো গ্রাম, আরেকদিকে পাহাড়। ওর কুঁড়েঘরের পরেই শুরু হয়েছে ঘন পাইন আর ফার গাছের ঘন জঙ্গল, পাহাড়ের গা ঘেঁষে ধাপে ধাপে উঠে গেছে সিসামাংপা-র চূড়ার দিকে।

দুইদিকেই চাইল থুবতেন, কই, শয়তানটা কই? আওয়াজটা দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছে, কিন্তু ব্যাটা লুকোল কোথায়?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে জঙ্গলের কাছে একটা ছায়ার দিকে চোখ গেল তার। ছায়াটা ফের একবার ভুক-ভুক আওয়াজ করে জঙ্গলের দিকে হাঁটা লাগাল। অন্ধকারের মধ্যেই ভুরু কুঁচকে সেদিকে চেয়ে রইল থুবতেন। ওটা শিনজে না? অবশ্যই শিনজে, নইলে অত বড় শরীরের কুকুর এ অঞ্চলে আর ক'টাই বা আছে?

লাঠিটা হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে ছায়াটাকে অনুসরণ করতে লাগল থুবতেন। ব্যাটা যাচ্ছে কোথায়?

ডিসেম্বর, ১৯৫৯। দিল্লি

ডিসেম্বরের কনকনে সন্ধে। কনট প্লেসের উত্তর পূর্ব দিকে একটা ন্যাড়া অমলতাস গাছ। তার ঠিক নীচে, অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মানুষটি।

সতর্ক চোখে চারিদিকে লক্ষ রাখতে রাখতে লাল অঙ্গবস্ত্রটি গায়ে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে নিলেন তিনি। জায়গাটা একটু আবছায়া মতো, তার ওপর সেখানে সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের হলদেটে মরা আলো পড়ে একটা অদ্ভুত আলো আঁধারির বিভ্রম তৈরি হয়েছে। তাতে চারিপাশের নির্জনতা আরও গাঢ়, আরও ঘন হয়ে এসেছে। এমনিতেই দিল্লির শীত অতীব কুখ্যাত, তার ওপর আজ উত্তুরে হাওয়ার দাপট যেন দেহের ভেতরকার অস্থিমজ্জাগুলো অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

আজ কি একটা কারণে দিল্লিতে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট স্ট্রাইক, তাই এই চত্বরে লোকজন নেই বললেই চলে।

যদিও এই স্ট্রাইক ব্যাপারটা ভালো বোঝেন না মানুষটি। ওঁদের দেশে তো স্ট্রাইক, হরতাল, চাক্কা জ্যাম, এসবের নাম গন্ধই ছিল না। এসব ঝুটঝামেলা এদেশে এসেই দেখেছেন।

ভাবতে-ভাবতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এই একাকী, উদ্বিগ্ন মানুষটি।

পাহাড়ের কোলে তো দিব্যি ছিলেন ওঁরা। কোথাও কোনও অসুবিধাই ছিল না! একদিকে উত্তুঙ্গ হিমালয়, আরেকদিকে সুগহীন উপত্যকা। তাদের কোল ঘেঁষে চঞ্চলা কিশোরীর মতো নেচে চলেছে পাহাড়ি নদী জাংপো। আরও দক্ষিণে সমতলে নেমে গৃহিণী হয় সে। তখন আরও ভারভাত্তিক হয় তার শরীর, অঙ্গে আসে সংসারী পৃথুল লাবণ্যের ছোঁয়া। তাকে ঘিরে থাকে পাইন, বার্চ আর জুনিপারের পরকীয়া ভালোবাসার ওম। সেই জাংপোর ধারে, সেই লেবুঘাস ছাওয়া জমিতে, সেই রডোডেনড্রন আর পাহাড়ি অর্কিডের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছেন তিনি। বড় হয়েছেন শাক্যসিংহের আশীর্বাদধন্য পবিত্র ভূমিতে। সে জীবন ছিল পাহাড়ের মতোই শান্ত, উপত্যকার মতোই উদার, জঙ্গলের মতোই সজীব।

আর আজ?

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালেন মানুষটি। ডিসেম্বরের ঘন নীল আকাশ থেকে, তারকাদের গা বেয়ে নেমে আসছিল ঘন কুয়াশার আস্তরণ। সেই কুয়াশাই যেন বিন্দু বিন্দু অশ্রু হয়ে জমে উঠছিল তাঁর চোখের কোণে। খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ রইলেন তিনি। এই তারাদের দল কি আজও তাঁর গাঁয়ের কুটিরটির ওপর এভাবেই করুণ স্নেহের চোখে তাকিয়ে আছে? তারও কি মন কেমন করে ঘরের ছেলেটির জন্য?

পরনের বস্ত্রখণ্ডটির খুঁটে চোখের জল মুছে নিলেন তিনি। মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিলেন। হবে হবে, একদিন অবশ্যই নৃশংস অত্যাচারী বিদেশিদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে তাঁর প্রিয়তম জন্মভূমি।

কয়েক মাস আগে হঠাৎ করেই তাঁদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি গায়ের জোরে তাঁদের পবিত্র মাতৃভূমি দখল করেছে। সেই আক্রমণের মুখে তাঁদের প্রধান ধর্মগুরু দলাই লামা এবং অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে প্রায় সহায় সম্বলহীন ভাবে এই দেশে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাঁদের। তখন এই দেশের গুপ্তচর সংস্থা, যার নাম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই বি, তারা নিঃশর্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁদের দিকে। সে উপকার জীবনে ভুলবেন না তিনি।

শুধু কি তাই? তাঁরা যে এই দেশে আদৌ রাজনৈতিক আশ্রয় পাবেন, সে বিশ্বাস তাঁদের একেবারেই ছিল না। তাঁরা শুনেছিলেন যে এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেশের দখলদার দেশটির প্রধানের বিশেষ সখ্যতা আছে। তবুও, তবুও এই দেশের প্রধানমন্ত্রী সেসব কূটনৈতিক সখ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই তাঁদের বুকে টেনে নিয়েছেন। শুধু যে বুকে টেনে নিয়েছেন তাই নয়, তাঁদের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে আবহাওয়া মেলে এমন একটি প্রদেশে তাঁদের থাকার বন্দোবস্তও করে দিয়েছেন। তিনি এও জানেন যে এই নিয়ে দুই বন্ধু দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাসের কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। তবুও এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁদের আশ্রয় দিতে দুবার ভাবেননি।

এই আশ্রয়দাতা দেশটির প্রতি, এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি, এই দেশের গুপ্তচর সংস্থাটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। হাজার হোক, শাক্যসিংহের জন্মভূমি বলে কথা। তারা এই উদার হৃদয়ের পরিচয় দেবে না তো কারা দেবে?

ঠান্ডাটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। মাথাটা সাবধানে বার করে ইতিউতি তাকালেন লোকটি। মল্লিক সাহেব বলেছিলেন এখানেই গোপনে অপেক্ষা করতে। আইবি'র লোক এসে এখানেই দেখা করবে তাঁর সঙ্গে। তারপর তারাই তাঁকে পৌঁছে দেবে ধরমশালায়, কাল দুপুরের আগেই।

নইলে মহা অনর্থ হয়ে যাবে যে!

চোখ দুটো একবার বন্ধ করলেন তিনি। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন যে আগামীকাল সকালে ধরমশালায় গোপন রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসছে। হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে যে মহাপবিত্র পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রীর মধ্য থেকে একটি অমূল্য মঞ্জুশ্রী উধাও! সেই নিয়ে কী করা হবে স্থির করতেই এই গোপন বৈঠক বা চক্র। স্বয়ং দলাই লামা এই চক্রানুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের ভার নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই চক্রের পবিত্রতা রক্ষার্থে আহ্বান করা হয়েছে দলাই লামার আজ্ঞাধীন গোপনতম যোদ্ধৃবাহিনী, মহাকালচক্রকে!

তিনি এও জানেন যে যদি তিনি কাল দুপুরের মধ্যে সেই চক্রে উপস্থিত থাকতে না পারেন, তবে সমস্ত সন্দেহ তাঁর ওপরে এসেই পড়বে।

আর তার ফলাফল?

মহাকালচক্রের হাত থেকে বাঁচা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভবও বটে।

একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। মল্লিক সাহেব কি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন?

হঠাৎ করেই তাঁর বাঁদিকে ছায়ার মতোই গজিয়ে উঠল কেউ। প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলেন তিনি। তারপর ছায়াটি তাঁর কাছে এসে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'মাচিস হ্যায়?'

প্রথমে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিলেন। তারপর সাজানো সংকেত বাক্যের উপযুক্ত উত্তরটি, যা তাঁকে পইপই করে শেখানো হয়েছিল, সেইটি ক্ষীণ স্বরে পেশ করলেন, 'থা, লেকিন ওঁস মে ভিগ গ্যায়া।'

লোকটা একটিও কথা না বলে নিজের পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে ধরল। লাইটার বার করে আগুন ধরালো তাতে। সেই অল্প আগুনের আঁচে ক্ষণমুহূর্তের জন্য লোকটির মুখ দেখতে পাওয়া গেল। একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

ভয় পাওয়ার মতো চেহারাই বটে। বুলডগের মতো মোটা থ্যাবড়া মুখ। ঘন জোড়া ভ্রূ, তার নীচে শান্ত অথচ সতর্ক দুটি চোখ। ডানদিকের কপালের ওপর থেকে ডানগাল অবধি একটা ক্ষতের দাগ নেমে এসেছে। চওড়া কব্জিতে মোটা বালা পরা, তাতে আগন্তুকের বাহুবলের আভাস পাওয়া যায়।

আগন্তুক চাপাস্বরে বললো, 'মেজর কুলদীপ শর্মা, আই বি। মুঝে চুপচাপ ফলো কীজিয়ে। দোনোকে বীচ দশ মিটার কী দূরী রেহনি চাহিঁয়ে।'

মিনিট দশেক ধরে আগন্তুককে অনুসরণ করতে লাগলেন লোকটি। এমনিতে রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। দোকানপাট বেশিরভাগ বন্ধই। মাঝেমধ্যে জনহীন রাস্তা দিয়ে উল্কার গতিতে উড়ে যাচ্ছে শৌখিন বড়লোকের অস্টিন আর স্টুডিবেকার। রাস্তার পাশে ছোট ছোট গুমটি। সেখানে আপাদমস্তক মোটা কম্বলে ঢেকে আড্ডা জমিয়েছে মজদুর কিসানের দল। তাদের ঠাট্টা ইয়ার্কির সঙ্গে ভেসে আসছে রেডিওতে খবর পড়ার শব্দ।

একটু পর হঠাৎ থেমে গেলেন আগন্তুক। তারপর সট করে সরে এলেন বাঁদিকে, একটা পিপুলগাছের ছায়ায়।

একটু ইতস্তত করে সেদিকেই হেঁটে গেলেন লোকটি। হিমালয়ের কোলে বড় হয়েছেন, এই ঠান্ডা তাঁর কাছে কিছুই না। তবুও ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিলেন।

পিপুল গাছের নীচে আড়ালে রাখা একটা জিপ। তাতে উঠে বসলেন আগন্তুক। তারপর লোকটিকে ইশারা করলেন তাঁর পাশে উঠে বসতে।

দুজনের কেউই জানলেন না যে জিপ স্টার্ট করে তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর অন্ধকার থেকে সেখানে উদয় ঘটল চারটি ছায়ার। চারজনেই নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া জিপের দিকে।

'আইটেমকা অগলা ড্যান্স পার্টি কাঁহা হ্যায়?' ভারিক্কি স্বরে প্রশ্ন করল একজন।

'পাণিপথ।' অন্য আরেকজনের উত্তর।

'উঁহা সে ফির কাঁহা? চিড়িয়া কাঁহা যায়েগা?' ভারিক্কি স্বরের প্রশ্ন।

'আপনে ঘোঁসলে মে, জনাব।'

'খবর পাক্কি হ্যায় না?' আবার সেই ভারিক্কিস্বর।

'জি জনাব।' সংক্ষিপ্ত উত্তর এল বাকি তিনজনের মধ্যে একজনের কাছ থেকে।

'বড়ে সা'ব কাঁহা হ্যায়?'

'জি উসি কে আসপাস।'

'বঢ়িয়াঁ। ভাই নে চিঠ্ঠি আপনে সাথ হি রখখা হ্যায়, ইয়া অলরেডি পোস্ট কর দিয়া?'

'ব্যস, উওহি পতা নেহি চল পায়া জনাব। আপনা এজেন্টলোগ কাম পর লগে হুঁয়ে হ্যায়। আজ রাত তক পতা চল যায়েগা।'

'বেওকুফ,' চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'তুম লোগোঁ কো কীস চিজ কা প্যায়সা দেতে হ্যায় হাম? ইতনা সা ইনফরমেশন ভি ঠিকঠাকসে নেহি লা পায়া? বড়ে সা'ব কো কেয়া জবাব দুঁ ম্যায়?'

বাকি তিনজনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'চিড়িয়া ঘোঁসলে তক পহোঁচ নে সে পেহলে আপনি হাথ মে আনি চাহিয়ে।' ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শীতল ইস্পাতের মতো আদেশ ভেসে এল।

'লেকিন অগর চিঠ্ঠি নেহি মিলি তো...চিঠ্ঠি অওর চিড়িয়া, দোনো একসাথ চাহিয়ে না?' মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে একজন।

'উও মুঝে সোচনে দিজিয়ে জনাব, সোচনে কা কাম মেরা হ্যায়।' ছদ্মবিনয়ের আড়ালে ঝলসে উঠল তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, 'আপ ব্যস আপনা কাম কীজিয়ে।'

'জি জনাব।' চুপ করে যায় তিনজনেই। তারপর ছায়ার মতোই অন্ধকারে মিশে যায় চারজন।

দেড়হাজার বছর আগে

অন্ধকারে চোখ জ্বলে বলে সুনাম আছে থুবতেনের। এই জঙ্গল আর জঙ্গলের সুঁড়িপথ হাতের তালুর মতোই চেনে সে। তা সত্ত্বেও আজ সবকিছু ভালো ঠাহর হচ্ছিল না তার। পাহাড়ি পাকদণ্ডীর ধার ঘেঁষে নেমে আসছে থকথকে নীল কাদার মতো কুয়াশার চাদর। তার মধ্যে শিনজে এক-একবার হঠাৎ করে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে গাছের আড়ালে। হাতের লাঠিটা সম্বল করে কোনোমতে দিশা ঠিক রেখে পথ হাঁটছিল থুবতেন।

থুবতেন বুঝতে পারছিল, যে রাস্তায় শিনজে তাকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে গেছে। খুব প্রয়োজন না থাকলে এই দ্রোমো গ্রামের কেউই যায় না সেদিকে।

খানিকক্ষণ বাদে থুবতেন টের পায় যে, কোনো একটা চাতালের ওপর এসে পৌঁছেছে সে। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে থাকে থুবতেন। গেল কই শয়তানটা?

হঠাৎ করেই যেন থুবতেনের চারিপাশ থেকে কুয়াশার চাদর উঠিয়ে নিল কেউ। সবকিছু বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল তখন। তখনই থুবতেন বুঝতে পারল যে, শিনজে হতচ্ছাড়া কুয়াশার আড়ালে তাকে এমন জায়গায় এনেছে, যেখানে মেরে ফেলার ভয় দেখালেও দ্রোমো গ্রামের একটাও লোক আসতে চাইবে না।

এটা ইদিয়াগ তাল, প্রেতদের মিলনভূমি। লোকে বলে ডাইনিচাতাল। দ্রোমো গ্রামের অধিবাসীদের এই এলাকায় আসা কঠোরভাবে মানা। এখানে পথ ভুলে এসে কত লোকই যে ডাইনিদের শিকার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জায়গাটা চেনার কথা নয় থুবতেনের, চিনল চাতালটার আকৃতি দেখে। লোকে জায়গাটার নাম দিয়েছে ডাইনির ঝাঁটা। একটু ওপর থেকে দেখলে চাতালটা ঝাঁটার মতোই দেখায় বটে। ঝাঁটার লেজের দিকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল থুবতেন।

হতচ্ছাড়া শিনজেটা এই ডাইনিচাতালে তাকে ডেকে এনে নিজে লুকোল কোথায়?

এইবার চাতালের মাথার দিকে চোখ যায় থুবতেনের। হালকা কুয়াশা আর তারার আলোয় তার মনে হয় কারা যেন নড়াচড়া করছে সেখানে। এত দূর থেকেও তাদের মধ্যে একজনকে তার মাথার লম্বাটে টুপিটা দেখে চিনতে পারে থুবতেন।

ওর মনিব, ওয়াংচুক।

এত রাতে ডাইনিচাতালে কী করছে ওয়াংচুক? সঙ্গে ওরাই বা কারা?

থুবতেন ভয় পাচ্ছিল খুবই। তবে তার থেকেও উদগ্র হয়ে উঠছিল তার কৌতূহল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে, অতি ধীরে ডাইনি চাতালের মাথার দিকে এগোতে থাকে থুবতেন।

ডিসেম্বর, ১৯৫৯। দিল্লি

রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে দ্রুত উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কালো রঙের উইলিস জিপটা। গাড়ির নাম্বারটা দিল্লির কোনও এক সর্দারজির নামে রেজিস্ট্রেশন করা আছে বটে, তবে সেটা ভুয়ো। শুধু নাম্বার কেন, পুরো সর্দারজিই ভুয়ো, নাম ঠিকানা সুদ্ধু।

ডিসেম্বরের ঠান্ডার থেকেও মানুষটাকে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছিল ভেতরের গোপন উত্তেজনা। গাড়িতে ওঠার পর থেকে এই অজানা আগন্তুক তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। তাতে অবশ্য তাঁর সুবিধাই হয়েছে একদিক থেকে। গত দুদিন ধরে যা যা করেছেন তিনি, সেই নিয়ে নিজের ভেতরেই একটা পর্যালোচনা করছিলেন তিনি।

তিনি লোবসাং গিয়াৎসো, দলাই লামার ঘনিষ্ঠতম মহলের একজন। শুধু তিনি নন, তাঁর উত্তরপুরুষেরাও কদম্পা ধর্মমত এবং দলাই লামা'র সেবা করে এসেছে বংশপরম্পরায়। তবে তাঁর সময়েই পোতালা প্রাসাদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের দহরম-মহরম বেশি বেড়েছে। তার অবশ্য একটা অন্য কারণও আছে।

কিংবদন্তী অনুযায়ী তাঁর এক পূর্বপুরুষ স্বয়ং গুরু রিন পো চে'র আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। গুরু রিন পো চে'র স্বহস্তলিখিত একটি পুঁথি তাঁদের কাছে বংশপরম্পরায় বহুদিন অবধি রয়ে গেছিল। লোবসাং এর পূর্বপুরুষরা গৃহী ছিলেন। লোবসাং সন্ন্যাস নেন। সেই সঙ্গেই মহামূল্যবান পুঁথিটি তিনি দলাই লামার কাছে হস্তান্তরিত করেন।

তারপরেই পুঁথিটি পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রীর একটি বলে গণ্য হয়। পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রী হচ্ছে কদম্পা ধর্মমতের এমন পাঁচটি পবিত্রতম পুঁথি যা একমাত্র স্বয়ং দলাই লামা বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও দেখার অধিকার নেই। আর পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রীর একটি মঞ্জুশ্রীকেও যদি দলাই লামার গুপ্তকক্ষ থেকে অপসারণ করা হয় তবে তার উদ্ধারকল্পে একটিমাত্র পন্থাই নেওয়া হয়।

আহ্বান করা হয় মহাকালচক্রকে!

কেউ জানে না কী এই মহাকালচক্র। কারা এর সদস্য, কী তাদের পরিচয়, কীভাবে কাজ করে তারা। লোকে শুধু জানে এরা একমাত্র দলাই লামার আজ্ঞাধীন। তিনি ছাড়া এদের পরিচয় আর কেউ জানে না। অন্ধকারের গহীনতম শক্তি এই মহাকালচক্র। এরা পারে না হেন কোনো কাজ নেই। গুপ্তহত্যায় এদের সিদ্ধি প্রবাদপ্রতিম, আর মহাকালচক্রের হাতে মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর, বড় নৃশংস।

চোখ বুঝলেন লোবসাং। শীতের দিল্লির রাত যেন অন্ধকার স্রোতের মতো ঝাপটা মেরে যাচ্ছিল তাঁর মুখে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছিলেন না। তাঁর মনের মধ্যে যে ঝড় বইছিল, তার তুলনায় এ হাওয়ার ঝাপটা এমন কিছুই না।

অনেক ভেবেছেন তিনি, নিজের সঙ্গে যুক্তিতর্ক দিয়ে অনেক লড়াই করেছেন, তবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এখন এই সিদ্ধান্তের দায় ও দায়িত্ব একমাত্র তাঁর।

পূর্বপুরুষেরা তাঁর সহায় হবেন তো?

যতদিন পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রী পোতালা প্রাসাদে ছিল, সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু এখন বিদেশবিভুঁইতে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে তিনি একেবারেই নিশ্চিন্ত নন। যদিও এদেশের সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁদের ও তাঁদের ধর্মীয় সম্পত্তির কোনও ক্ষতি হবে না, তবুও সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তিনি। চীনের গুপ্তচরেরা যে ইতিমধ্যেই ধরমশালা পৌঁছে যায়নি তার নিশ্চয়তা কী?

দেড়হাজার বছর প্রায় শেষ হওয়ার দিকে। আর মাত্র সত্তর বছর বাকি। যদি কিছু হয়ে যায় তাঁর বা এই পুঁথির, তাহলে কী করে উদ্ধার পাবেন তাঁর পূর্বপুরুষের আত্মা?

বড় ঝুঁকি নিয়ে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। করেছিলেন রতনলালের মাধ্যমে। দলাই লামার দেখভালের জন্য ভারত সরকার যে কয়েকজন সরকারি অফিসার নিয়োগ করেছেন, রতনলাল তাঁদেরই একজন। ইনি দলাই লামার সেক্রেটারি।

বেশ দ্রুতগতিতেই চলছিল জিপটা। পাণিপথ আসতে আর মিনিট দশেক বাকি। সেখানে কিছু ডিব্রিফ করার কাজ আছে। তারপর লোবসাং-এর হ্যান্ডলার-এর হাতে লোবসাংকে তুলে দিয়েই মেজর শর্মার ছুটি।

তাই হয়তো স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন মেজর শর্মা। ফলে হঠাৎ করে যখন ব্রেকটা একটু জোরে কষতে হল তাঁকে, তখন মুখ দিয়ে একটা কাঁচা খিস্তি বেরিয়ে এল।

রাস্তার ডানদিকে একটা বড় গাড্ডা, তাতে কাকচক্ষুর মতো জল জমে আছে। সেটা দেখেই ব্রেক কষেছিলেন মেজর শর্মা। তারপর রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে সাবধানে গাড্ডাটার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর স্টিয়ারিং সোজা করে ধরে সামনের দিকে তাকালেন তিনি।

এরপর গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়ির স্পিড উঠতে থাকার কথা। স্পিড উঠতে শুরুও করেছিল। কিন্তু গতিবেগ বাড়াবার মুখেই হঠাৎ করে জিপটা রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে সজোরে ব্রেক কষে থেমে যায়।

উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন লোবসাং, 'কেয়া হুয়া?'

'উই আর বিইং ট্র্যাকড,' দাঁত চিপে বললেন মেজর শর্মা, 'কোই পিছা কর রহা হ্যায় হামারা।' তারপর হোলস্টার থেকে একটা রিভলভার বার করে শ্বাপদের ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে। চাপা গলায় আদেশ দিলেন, 'কাম অ্যালং।' তারপর সেঁটে গেলেন রাস্তার ধারের অন্ধকারে।

লোবসাং এর নামতে একটু দেরি হল। কারণ, ব্যাপারটা তাঁর মাথায় সেঁধোয়নি ঠিকঠাক। প্রথমত তাঁদের গাড়ির পিছনে দূর দূর অবধি কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এভাবে কারও পিছু নেওয়া যায় কী করে সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। দ্বিতীয়ত যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়াও যায় যে কেউ পিছু নিয়েছে সেটা মেজর শর্মা বুঝলেন কী করে?

মেজর শর্মা বোধহয় লোবসাং এর মনের জিজ্ঞাসাটা বুঝতে পারলেন। একটু নীচু হয়ে বসে গাড়ির চেসিসের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

প্রথমে ব্যাপারটা বোঝেননি লোবসাং। তারপর খানিকটা লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন চেসিসের ঠিক নীচে একটা লাল আলোর বিন্দু একবার জ্বলছে আর নিভছে। আর সেই সঙ্গে একটা অতি ক্ষীণ বিপ-বিপ আওয়াজ ভেসে আসছে।

'রেডিও রিসিভার!' ফিসফিস করে বললেন মেজর শর্মা, 'কোই ইসকো ফিক্স কিয়া হ্যায় মেরে গাড়িকে নীচে।'

যন্ত্রটা যে ঠিক কী সেটা মাথায় ঢুকল না লোবসাং-এর। তবে তিনি বুঝলেন যে খেলা শুরু হয়ে গেছে। যে বিপদ এড়াবার জন্য এত তোড়জোড়, সেটা এখন তাঁর ঘাড়ের ওপর থাবা চাটতে চাটতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়। এখন তাঁরা শিকার ছাড়া আর কিছু নন। সেই শিকারের খোঁজে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পড়েছে হিংস্র হায়েনার দল।

তবুও একটা প্রশ্ন কিছুতেই তাঁর কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল না, মেজর শর্মা এই যন্ত্রটার অস্তিত্ব বুঝতে পারলেন কী করে?

জল। ভাবতে ভাবতেই কেউ যেন উত্তরটা মাথার মধ্যে গেঁথে দিল লোবসাং-এর। রাস্তায় জমে থাকা জলে নিশ্চয়ই ওই লাল আলোর প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন মেজর শর্মা। অভিজ্ঞ আইবি অফিসারের চোখ এড়ায়নি সেই বিপদের সংকেত। দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করছিলেন মেজর শর্মা, 'ইসকা মতলব কিসি কো পতা হ্যায় ইস মিশন কে বারে মে। দিস মিশন ইজ কম্প্রোমাইজড নাউ। উই হ্যাভ আ মোল ইনসাইড আই বি...কওন হো সকতা হ্যায়, কওন হো সকতা হ্যায়...'

যেখানে মেজর শর্মা গাড়ি থামালেন, সেখান থেকে ঠিক আট কিলোমিটার দূরে, পাণিপথ শহরে ঢোকার ঠিক আগে বিশাল বড় বটগাছটার নীচে একটা ধাবা আছে। লোকে বলে লল্লন সিং-এর ধাবা, এই লাইনের ট্রাক ড্রাইভার আর খালাসিদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তাদের ভিড়ে সদাসর্বদাই জমজমাট থাকে জায়গাটা। তাছাড়া লল্লন সিং নিজেও রোজ সন্ধে হলেই ইয়ার দোস্ত নিয়ে মদ মাংসের আসর বসায় ধাবার পিছনদিকটায়। তাদের হইহল্লা আর গজল্লায় চাকনাচুর হয়ে থাকে ধাবাটা।

তবে আজ শীতের দাপটের জন্যই হোক, বা স্ট্রাইকের কারণেই হোক, জায়গাটা বেশ ফাঁকা। কোনও এক অজানা কারণে পুরো জায়গাটা জুড়ে ভারী নিস্তব্ধতা চেপে বসে আছে।

ধাবার ঠিক সামনে আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা মস্ত বড় জিপ। তার পেছনের সিটে মোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে, অলসভাবে গা এলিয়ে বসেছিল তিনজন লোক। ড্রাইভারের সিটে বসে একজন লোক হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে কী যেন খুটখাট করছিল। আর তার পাশে স্থির হয়ে বসেছিলেন একজন।

হঠাৎ করেই সজাগ হয়ে উঠল ড্রাইভারের সিটে বসা লোকটা। যন্ত্রটা সজোরে বন্ধ করে পেছনে ফিরে রুদ্ধশাসে বলল, 'লগতা হ্যায় কে সালোঁ নে পকড় লিয়া আপনা টেকনিক। রেডিও রিসিভার কা সিগন্যাল পিছলে পন্দরহ মিনিট সে একহি জগাহ পে রুকি হুই হ্যায়। মেশিন নিকাল বৈজনাথ, ভাগ রাহা হ্যায় দোনো। ভাগনে সে পেহলে পকড়না পড়েগা সালোঁকো', বলেই জিপ থেকে লাফিয়ে নামল লোকটা। তার হাতে উঠে এসেছে একটা আধহাত লম্বা জার্মান মাউজার হ্যান্ডগান।

বাকি লোকজনের জড়তাও কেটে গেল মুহূর্তেই। তিনজোড়া পা যেন হিংস্র চিতাবাঘের মতোই লাফিয়ে নামল মাটিতে। প্রত্যেকের হাতেই উঠে এসেছে একটা করে রিভলভার। তাদের পরনে আঁটোসাঁটো পোষাক, পেশিতে খুনে ক্ষিপ্রতা, চোখেমুখে উদগ্র হিংসার ছায়া। তাদের নিয়ে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতোই সামনের দিকে ধেয়ে গেল তাদের দলনেতা।

সামনের সিটে স্থির বসে থাকা লোকটা নড়ল না বিন্দুমাত্র। সবাই দৌড়ে চলে গেলে ধীরেসুস্থে নামল সে। তারপর গাড়ির পেছনে এসে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল একবার।

গাড়ির পিছনে একটা চাইনিজ মিলিটারির অ্যাডভান্সড প্ল্যাটুন রেডিও সিস্টেম ফিট করা আছে। চালুই ছিল যন্ত্রটা। সেখান থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ভারী স্বরে বলল লোকটা, 'এজেন্ট আর এল এম, কোড সিক্স ওয়ান নাইন। পুট মি টু হিজ হোলিনেস প্লিজ।'

লোবসাং জানতেও পারলেন না, কোন অলৌকিক উপায়ে পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রীর হারানো পুঁথির খবর দলাই লামার আগেই মহাকালচক্রের কাছে পৌঁছে গেল!

দেড়হাজার বছর আগে

ডাইনিচাতালের মাথার কাছাকাছি একটা পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল থুবতেন। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে উবু হয়ে কী যেন একটা করছিল ওয়াংচুক। ওদিকটা একটু অন্ধকার থাকায় সেটা ঠিক ঠাহর

হচ্ছিল না থুবতেনের। ওয়াংচুককে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে একজনের চওড়া কাঁধ দেখে চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল তার, কিন্তু এতদূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কে সেই লোকটা।

প্রহরখানেক এইভাবে কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই মেঘ সরে গিয়ে আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পুরো ডাইনিচাতাল। আর তখনই ওয়াংচুক বড়ো ছুরির মতো কী একটা যেন বেশ উঁচুতে তুলে ধরে, তাই দেখে হর্ষধ্বনি করে ওঠে বাকিরা।

বড় ছুরিটা দেখেই আঁতকে উঠল থুবতেন। ওটার নাম ফুর-পা, মন্ত্রপূত ছুরি। অপদেবতার পুজোয় ইয়াক বলিদান দিতে কাজে লাগে ও জিনিস।

এবার বাকিদেরও বেশ পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল, এমনকী চওড়া কাঁধের লোকটাকেও। লোকটাকে চেনামাত্র থুবতেনের হৃৎপিণ্ডটা একলাফে তার গলার কাছে এসে আটকে যায়।

মহামন্ত্রী মাশাং? এখানে? এই সময়ে?

সম্রাটের পরেই তিব্বতের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ এই মাশাং। তাঁর প্রতিপত্তিই আলাদা। দলবল, দেহরক্ষী ইত্যাদি ছাড়া তিনি বাইরে বেরোনই না। এমন গুরুত্বপূর্ণ একজন গ্রামে এলে তো হুলস্থুল পড়ে যাওয়ার কথা। কই, সারাদিন শিনজেকে খোঁজার সময় এসব কিছুই তো কানে আসেনি ওর? এত রাতে মন্ত্রীমশাই এখানে কী করতে এসেছেন চুপিচুপি?

ওয়াংচুক আর মহামন্ত্রীকে ছাড়া আরও দু'একজনকে চিনতে পারল থুবতেন, যেমন গাঁয়ের পুরোহিত রাবগিয়াল। বাকিরা ওয়াংচুকের সাঙ্গোপাঙ্গ, গাঁয়েরই লোক। নিজেদের মধ্যে স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলছিল ওরা। অর্থাৎ ওরা জানে যে এখানে গ্রামের কারও আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

একজন এসে একটি ছোট মশাল পাশেই পাথরের খাঁজে গুঁজে দিতে সব কিছু বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল থুবতেন।

খানিক পরে মাশাং তাঁর পরনের জোব্বাটি খুলে, মাটিতে পেতে রাখা একটি চামড়ার আসনে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন 'এই উত্তুঙ্গ পাহাড়, এই গহীন উপত্যকা আর এই অগণন নক্ষত্রশোভিত আকাশকে সাক্ষী রেখে শুরু করছি এই জিজিদ। আমাদের এই প্রেতসাধনা যেন সফল হয়। আজ যে জিজিদ আমরা পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনব, তা যেন এই অত্যাচারী রাজার কবল থেকে মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে।'

জিজিদ কী তা শুনেছে থুবতেন, কিন্তু কখনও দেখেনি। এ নাকি মানুষের আত্মার মধ্যে কোনো অপদেবতাকে গেঁথে দেওয়ার মন্তর। তারপর যে জিজিদ করে, সেই আত্মা তার বশ হয়ে যায়, তাকে দিয়ে তখন যা খুশি করানো যায়। এ খুব সাঙ্ঘাতিক ভূতবিদ্যা, কোটিতে গুটিক পুরোহিত পারেন। মহামান্য মাশাংও পারেন নাকি?

ওয়াংচুক ধীর পায়ে মাশাঙের সামনে এল। তারপর একটা ছোট জিনিস বার করে আনল জোব্বার ভেতর থেকে।

ইয়াকের শিং। একপাশটা বোধহয় ঘষে ঘষে ধারালো করা হয়েছে, মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল সেটা। মাশাং তাঁর বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন ওয়াংচুকের সামনে।

তারপর ওয়াংচুক যেটা করল সেটা দেখে আরেকটু হলেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে আসছিল থুবতেনের মুখ থেকে। বহুকষ্টে মুখের মধ্যে নিজের হাতটা ঢুকিয়ে চিৎকারটা থামালো সে।

কী একটা মন্ত্র বিড়বিড় করতে করতে নির্বিকার মুখে ইয়াকের ধারালো শিংটা মাশাঙের কনুইয়ের নীচে গেঁথে দিল ওয়াংচুক। তারপর সেটা টেনে নিল কব্জি বরাবর।

ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছিল মাশাং-এর বলিষ্ঠ বাঁ-হাত থেকে। তবে তাঁর মুখে সামান্যতম বিকারও দেখা যাচ্ছিল না। দ্রুতলয়ে অথচ শান্ত মুখে মন্ত্রপাঠের মতো কিছু বলছিলেন তিনি। সেই গড়িয়ে পড়া রক্তের স্রোত যেন একটি ছোট কুণ্ডের সৃষ্টি করছিল মাশাং এর পায়ের কাছে।

রক্তকুণ্ডটিতে ওয়াংচুক তার হাতে ধরা শিঙের ডগাটি চুবিয়ে নেয় একবার। তারপর মাশাং যেখানে বসেছিলেন ঠিক তার সামনে মাটিতে কী যেন একটা আঁকতে থাকে। আঁকা শেষ হলে স্থিরদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মাশাং। তারপর প্রসন্নস্বরে বললেন, 'অতি উত্তম যন্ত্র এঁকেছিস ওয়াংচুক। কইরে তোরা, দেরি হচ্ছে কেন? নিয়ে আয় জিজিদকে।'

দূর থেকে সাড়া আসে রাবগিয়ালের, 'নিয়ে আসছি প্রভু, এখনই।'

একটু পরেই দেখা যায় যে তিনটি মানুষ একটি বড়ো পাথরের টুকরোর ওপর কী যেন একটা চাপিয়ে নিয়ে এসে রাখে মাশাং-এর পায়ের কাছে। তারপর দূরে সরে যায়। কালো কাপড়ে ঢাকা গোলমতো জিনিসটা কী, দূর থেকে বুঝতে পারে না থুবতেন।

এর পর একটি পাত্র থেকে খানিকটা জল নিয়ে সবকিছুর ওপর ছিটিয়ে দিতে থাকেন মাশাং আর ওয়াংচুক। সঙ্গে চলতে থাকে গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। বাকিরা হাঁটু গেড়ে বসে সেই সুরে গলা মেলায়। সেই ভূতুড়ে সুরে মাতালের মতো দুলতে থাকে সিসামাংপা র বাতাস।

সব কিছু শেষ হলে ফুর-পা'টা তুলে গোলমতো বস্তুটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেন মাশাং। তারপর গম্ভীর ও কর্কশস্বরে বলেন, 'হে মৃত্যুর অধীশ্বর খ্যুং গংপো, আজ আপনি আমাদের সহায় হোন। এই পবিত্র ত্রিকোণ ভূমিতে মন্ত্রপূত রক্ত দিয়ে এঁকেছি বজ্রকীলকযন্ত্র। মৃত্যুপ্রহরী যমান্তককে আহ্বান করছি তাঁর শূল নিয়ে নেমে আসতে। যে জিজিদকে আমরা নামিয়ে এনেছি এই পৃথিবীর মাটিতে, তার হিংস্র নখরে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সম্রাট মে অগছোমের অপবিত্র দেহ। তার তীক্ষ্ন দাঁত যেন ছিঁড়ে ফেলে রাজকুমার ঠ্রিসং দেচেনের কণ্ঠনালী। মহান পোন ধর্মের জয়পতাকা যেন চিরউড্ডীন থাকে আমাদের মাতৃভূমির বুকে। বৌদ্ধধর্ম নামক এই নপুংসকের ধর্ম যেন আমাদের গ্রাস না করতে পারে, আমাদের যেন অহিংসার নামে নির্বীর্য না করতে পারে।'

বলতে-বলতেই একটানে সেই গোলবস্তুটির ওপর থেকে কাপড়ের টুকরোটি সরিয়ে ফেলেন মাশাং।

হয় থুবতেন তখন খুব ভয় পেয়েছিল, ভয়ার্ত স্বেদের কিছু ফোঁটা দৃষ্টি রুদ্ধ করে রেখেছিল তার। অথবা উত্তেজনায় চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে গেছিল। তাই প্রথমটা সে ঠিকঠাক দেখতে পায়নি, বৃত্তের মধ্যে রাখা বস্তুটি কী। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের ওপর জমে থাকা ঘাম মুছে নেয় সে, তারপর তার দৃষ্টি চলে যায় সেই বৃত্তটির মধ্যে।

ওখানে কী ওটা? কার একটা কাটা মাথা বলে মনে হচ্ছে না?

এরপর হঠাৎ করেই যেন মশালের নীলচে কালো আলোগুলো দপ করে জ্বলে ওঠে। আর সেই আলোয় থুবতেন স্পষ্ট দেখতে পায় মাথাটাকে। ওটা কোনো মানুষের মাথা নয়।

ওটা একটা দ্রোক-খি'র মাথা।

সেই দ্রোক খি'টা আর কেউ নয়, শিনজে!

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল থুবতেন। ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্রোধে আর দুঃখে সারা গা থরথর করে কাঁপছিল তার। মনে হচ্ছিল তার দুই হাঁটুতে যেন কোনো সাড় নেই। কে যেন একটানে কেড়ে নিয়েছে তার বুকের বাতাস।

শিনজে? শিনজে? শিনজে? শিনজেকে ওরা খুন করেছে?

উল্লসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন মাশাং, 'শাবাস ওয়াংচুক, শাবাস। এর থেকে মন মতো কোনো জিজিদ হয়তো আমি নিজেও খুঁজে পেতাম না। আমি সম্রাট হলেই তোর কপালে মন্ত্রী হওয়া বাঁধা রে ওয়াংচুক।

এখন চল রে তোরা, চল ঝরনার জলে হাত-পা ধুয়ে আসি। একবার শুধু এই জিজিদ প্রেতদেহ পাক, তাকে পোতালা প্রাসাদে রেখে আসার যা অপেক্ষা, তারপরেই...!'

বেশ কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় ডাইনিচাতালের অন্যদিকে।

কিছু বোঝার আগেই থুবতেন দেখল, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনুষ্ঠান ভূমির দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেল থুবতেন। তারপর গেঁথে থাকা ফুর-পা-টা

একটানে খুলে ফেলে শিনজের মাথাটা তুলে নিল নিজের হাতে।

শিনজের মাথাটা সেই কালো কাপড়ে জড়িয়ে দ্রুত জঙ্গলে ঢুকে পড়ে থুবতেন। যে রাস্তা তাকে নিয়ে যাবে তার গ্রামের দিকে, সে দৌড়তে থাকে তার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে।

মাশাং-এর লোকগুলো যদি তাকে ধরতেও আসে, তারা জানবে না সে পালিয়েছে সম্পূর্ণ অন্য রাস্তা ধরে। থুবতেন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে পাহাড়ের ওপারে এক দেশের দিকে, মানজ্বালার দিকে। অনেক দিন আগে সেই জাদুকর লোকটা এসে তাকে বলে গেছিল না, খুব বিপদে পড়লে কোথায় যেতে হবে তাকে?

ওখানেই যাবে থুবতেন।

পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে থুবতেন। শুধু একটা খটকা রয়ে গেছে তার মনে।

শিনজেকে যদি ওরা খুনই করে থাকে, তাহলে ওকে এখানে ডেকে আনল কে?

খেরি নঙ্গল। পাণিপথ। ১৯৫৯

লোকটা প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে খানাখন্দভরা পিচের রাস্তা পেরিয়ে, পাহাড়ি জঙ্গল পেরিয়ে, টিলা আর পাথর ভরা ঊষর প্রান্তর পেরিয়ে। আশ্চর্যভাবে প্রতি বাঁকে বদলে যাচ্ছে তার পথ। আর সেই বদলে যাওয়া পথের স্রোত ধরে প্রাণভয়ে উদভ্রান্তের মতো দৌড়চ্ছে লোকটা। কীসের একটা পুঁটুলি বুকে জড়িয়ে নিয়েছে সে। কোনওভাবেই হাতছাড়া করা চলবে না সেটা। সেটা হাতছাড়া হলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে।

দৌড়তে-দৌড়তেই একবার থমকায় লোকটা। একটু দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো হাঁপাতে থাকে। এবার মনে হচ্ছে যেন ফুসফুসদুটো ফেটে যাবে তার, চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে-হাঁপাতেই কান দুটো পেতে কীসের একটা শব্দ শোনার চেষ্টা করল সে একবার।

ওই তো, ওই তো ওরা আসছে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদের। শিকারের গন্ধ পেয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছে হিংস্র চিতাবাঘের দল।

ফের দৌড়তে থাকে সে। থেকে থেকে তার পথ বদলে যায়। পাইন আর রডোডেনড্রন ঘেরা পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ওপরে উঠতে থাকে সে। তাকে পৌঁছতেই হবে কোথাও একটা। কোথায় পৌঁছতে হবে সেটা ভালো করে জানে না সে। কিন্তু তার রক্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জন্মজন্মান্তরের ইঙ্গিত যেন তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কোন এক অজানা উদ্দেশ্যে...

মুখের ওপর জলের ঝাপটা এসে পড়তেই যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন লোবসাং গিয়াৎসো। একটা বড় শ্বাস নিয়ে ধড়ফড় করে উঠলেন। তারপর যেভাবে পেঁজা তুলোর মতো বরফ নিঃশব্দে নেমে আসে মাটির ওপর, সেভাবেই তাঁর চেতনা ফিরে আসতে লাগল।

অতি কষ্টে চোখদুটো খোলার চেষ্টা করলেন তিনি। চোখের সামনেটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সেটা তাঁর দৃষ্টিশক্তির জন্য, নাকি তাঁর মুখের ওপর ঝাপটা দেওয়া জলের জন্য সেটা ঠিক ঠাহর হল না লোবসাং-এর। তিনি শুধু এটুকু অনুভব করলেন যে গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া জলের প্রতিটি ফোঁটা তাঁর শরীরে তুষের আগুনের মতো বিঁধছে।

শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল লোবসাং-এর। বরফের দেশের মানুষ তিনি, তবুও শরীর জুড়ে এই ঠান্ডা বরফশীতল জলের ধারা যেন তাঁর অস্থিমজ্জা অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

হাত দিয়ে মুখটা মোছার চেষ্টা করলেন লোবসাং। কিন্তু হাতদুটো একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট ঝনঝন আওয়াজ তুলে থেমে গেল।

হাতদুটো আরেকটু টানলেন তিনি। ফের সেই ঝনঝন আওয়াজ উঠল, কিন্তু হাতদুটো এগোল না। কীসের একটা বাধা পেরিয়ে ও দুটো এগোতে চাইছে না একেবারেই।

অতি কষ্টে চোখদুটো খুললেন লোবসাং।

প্রথমে যেটা নজরে পড়ল সেটা হচ্ছে পাথর। পাথর মানে এমনি পাথরের টুকরো না, মসৃণভাবে পালিশ করে করা পাথর। এদেশে এরকম পাথর চৌকো করে কেটে কেটে ঘরের মেঝেতে লাগায়, দেখতে সুন্দর লাগবে বলে। তাকে বলে মার্বেল। এ হচ্ছে সেইরকম মার্বেল পাথরের মেঝে।

তার মানে তিনি এখন মেঝেতে শুয়ে আছেন। কারণ, তাঁর চোখটা মেঝের একদম কাছে, মেঝের সমান্তরালে। আর তাঁর ডানদিকের গালটা মেঝের ওপর ঠেকানো। আর সেই গালের নীচে একটা ছোট পুকুর তৈরি হয়েছে। জলের পুকুর।

সেই জলের রঙ লাল।

চোখের দৃষ্টিটা একটু প্রসারিত করে নিজের হাতদুটোর দিকে তাকালেন লোবসাং। এবার তিনি বুঝতে পারলেন কেন অনেক টানার পরেও তাঁর হাতদুটো কাছে আসছিল না।

তাঁর দুটো হাতই, লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। হাতদুটো টানার সময় শেকলেরই ঝনঝন শব্দ শুনছিলেন তিনি।

কেন? তাঁর হাত বাঁধা কেন? তিনি মেঝেতে শুয়ে কেন? এত জল ঝাপটাচ্ছে কে তাঁর ওপর? আর সেই জলের প্রতিটি কণা তাঁর চামড়ার স্বেদগ্রন্থি ছুঁয়ে হাড়মাংস কাঁপিয়ে দিচ্ছে কেন? তাঁর পোশাকআশাক গেল কোথায়?

গায়ের ওপর একটা শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাওয়ার পর এর কারণটা বুঝলেন লোবসাং। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলেন তিনি।

তিনি নগ্ন। সম্পূর্ণ নগ্ন! আর তাঁকে এই অবস্থায় দু-হাত-পা বেঁধে এই মার্বেল পাথরের ঠান্ডা মেঝেতে শুইয়ে রেখে গায়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছে ওরা।

কিন্তু ওরা কারা?

হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চমকের মতো সব কথা মনে পড়ে গেল লোবসাং-এর।

অন্ধকার রাস্তায় খানাখন্দ পেরিয়ে দৌড়চ্ছিলেন দুজনে। দৌড়তে-দৌড়তেই নিজের পরিকল্পনাটা জানিয়েছিলেন মেজর শর্মা।

যে জায়গায় ওঁরা গাড়িটা ছেড়ে এলেন, তার নাম সেওয়া। সেখান থেকে মাইলখানেক আগে একটা চৌমাথা। চৌমাথা থেকে বাঁয়ের রাস্তা ধরে নামলেই একটা ছোট গাঁও, তার নাম খেরি নঙ্গল। সেখানে ওঁর চেনা একজনের বাড়ি আছে। আপাতত রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে। শুধু তাই নয়, সেখানে পৌঁছতে হবে যথাসম্ভব নিঃশব্দে, কোনও সূত্র না রেখে।

তবে এই পরিকল্পনায় অসুবিধা শুধু একটা জায়গাতেই। সেওয়া থেকে খেরি নঙ্গল অবধি রাস্তাটা গেছে খোলা মাঠ আর ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। রাস্তাটা যে শুধু ভয়ানক নির্জন তাই-ই নয়, রাস্তায় ডাকাতের উৎপাতও সাঙ্ঘাতিক। ডাকাতের ভয় মেজর শর্মা পান না, দু-দশটা ডাকাতের মহড়া নেওয়া ওঁর কাছে তেমন কিছু নয়। কিন্তু ভয় হচ্ছে যে ডাকাতের মোকাবিলা করতে গেলে যে পরিমাণ গোলাগুলি চলবে তাতে শত্রপক্ষের জন্য ওঁদের লোকেট করা খুব সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু কে সেই শত্রুপক্ষ? হাঁপাতে-হাঁপাতেই প্রশ্ন করেছিলেন লোবসাং।

'ব্যস, এক উও হি তো পতা করনা হ্যায়,' দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন মেজর শর্মা, 'কোই তো পিছা কর রহা হ্যায় হামারা। দেয়ার মাস্ট বি আ মোল ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট...আই মাস্ট রিপোর্ট ইট টু ক্যাপ্টেন...'

কিন্তু রিপোর্ট করার আগেই...

ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করলেন লোবসাং।

খেরি নঙ্গলে ঢোকার ঠিক আগে একটা বড় ঝাঁকড়া গাছ আছে। এদেশের লোক বলে পিপল। সেখান অবধি পৌঁছতেই কারা যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওঁদের ওপর।

এই অতর্কিত আক্রমণের সামনে হতচকিত হয়ে গেছিলেন ওঁরা দুজনে। তাই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। অন্ধকারের গা চুঁইয়ে যেটুকু তারার আলো নেমে আসছিল, তার মধ্যেই লোবসাং দেখতে পাচ্ছিলেন যে মেজর শর্মা একাই লড়ে যাচ্ছেন সিংহবিক্রমে। লোবসাং নিজেও মার্শাল আর্টে সিদ্ধহস্ত, লড়াইটা তিনিও কম দেননি।

কিন্তু লড়াইটা ক্রমেই অসম হয়ে আসছিল। প্রতিপক্ষ সাধারণ গুন্ডা নয়, খালি হাতের লড়াইতে তারাও যথেষ্ট পারদর্শী। তার ওপর তারা সংখ্যাতেও যথেষ্ট বেশি।

লড়তে লড়তেই মাথার পেছনে একটা চোট পেলেন লোবসাং। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই দেখলেন তিনজন মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেজর শর্মার ওপর।

'চেয়ার পর ব্যয়ঠাও ইস হারামজাদেঁ কো। বেড়িয়াঁ ভি খোল দো,' কোথা থেকে একটা গম্ভীরস্বরে আদেশ ভেসে এল।

আচ্ছন্ন অবস্থাতেই লোবসাং বুঝতে পারলেন যে তাঁর হাতের শিকল খুলে নিচ্ছে কেউ। তারপরে একজোড়া বলিষ্ঠ হাত তাঁকে টেনে একটা বরফের মতো ঠান্ডা লোহার চেয়ারে বসিয়ে দিল।

এবার চোখ খুলে তাকালেন লোবসাং।

তাঁর সামনে একটা লোহার গোল টেবিল। তার ঠিক ওপরে সিলিং থেকে ঝুলে আছে একটা বালব। সেখান থেকে একটা হলদেটে জোরালো আলো বৃত্তাকারে অল্প দুলছিল টেবিলটার ওপর।

'অওর মিস্টার লোবসাং গিয়াৎসো, কেয়া হাল হ্যায়? সব ঠিক ঠাক না?'

ঘরের কোণা থেকে ফিকফিক করে কয়েকজনের হাসার শব্দ ভেসে এল।

চুপ করে রইলেন লোবসাং। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। শেষ পর্যন্ত এই মানুষটা? এই লোকটা তাঁকে শিকার করার জন্য এতদূর নীচে নেমেছে? একেই তিনি এতটা বিশ্বাস করেছিলেন? হা ঈশ্বর!

টেবিলের ওদিকটা অন্ধকার। সেখানে কে যেন ধীরপায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল। তার কোমর থেকে পেটের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে একটা হোলস্টার ঝুলছে, তাতে একটা রিভলভার গোঁজা।

'নাহানা হো গ্যায়া? বহুত বঢ়িয়াঁ। তো আভি ডিনার পে চলেঁ?'

আবার সেই খুকখুক হাসি। এবার আরেকটু জোরে।

নিজেকে বজ্রধ্যানে সন্নিহিত করলেন লোবসাং। এই মুদ্রায় সমস্ত পাশবিক অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা জন্মায় সাধকের। সেই ধ্যানমুদ্রায় লীন হয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলেন লোবসাং, হে তথাগত, আপনি বলে দিন প্রভু, এই ঘোর সঙ্কটকালে কী করা উচিত আমার!

দুটো হাত নেমে এল টেবলের ওপর। মোটা মোটা আঙুল, তাতে অনেক কাটাছেঁড়ার দাগ। এ হাত লোবসাং চেনেন, খুব ভালো করে চেনেন।

'জনাব, অভি আপ জরা কৃপা করকে বতায়েঙ্গে কে উও কিতাব কাঁহা রাখখে হ্যাঁয় আপ?'

দেড়হাজার বছর আগে

অন্ধকার রাত। বৌদ্ধবিহারের প্রতিটি প্রাণী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু একটিমাত্র ম্লান প্রদীপশিখা জেগেছিল আচার্যর ঘরে। ঘোর আতঙ্ক ও বিস্ময় মিশ্রিত চোখে তিনি তাকিয়ে ছিলেন তাঁর সামনে রাখা বস্তুটির দিকে।

'এ জিনিস কোথায় পেলি তুই?' আতঙ্কতাড়িত চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন আচার্য।

'বললাম তো, দেশ থেকে নিয়ে এসেছি।' ভাবলেশহীন মুখে বলে তাঁর সামনে বসা বিদেশি যুবকটি।

'হায়-হায়! এ যে মহা সর্বনাশা বস্তু রে! সাক্ষাৎ শমন। নরকের কোন অতল থেকে এ জিনিস তুলে এনেছিস তুই? এ যে মূর্তিমান ঘোর অমঙ্গল!' আচার্যের হাহাকারে গমগম করতে থাকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠখানি।

'কী করব? ওকে বড্ড ভালোবাসতাম যে।' নিরাসক্ত মুখে বলে ওঠে সেই তরুণ, 'তাই নিয়ে এলাম।'

'কে ও? কাকে নিয়ে এলি? কার কথা বলছিস তুই?' স্থবিরের স্বরে তখনও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

ক্লান্ত, রিক্ত, শূন্য চোখদুটো তুলে ভন্তের দিকে তাকায় যুবক। তারপর তর্জনী দিয়ে নির্দেশ করে সেই ঘোর অভিশপ্ত বস্তুটির দিকে, ফুরিয়ে যাওয়া স্বরে বলে, 'শিনজে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন দু'জন। হিমালয়ের এই সানুদেশে রাতের দিকে একটা চমৎকার মৃদুমন্দ হাওয়া ভেসে আসে, কবিরা যাকে সুমধুর মলয় সমীরণ বলেছেন। কিন্তু আজ যে হাওয়া বয়ে আসছে তাতে হাড়মজ্জা অবধি থরথর কেঁপে উঠছে দু'জনেরই। এই সময়ে বাতাসে শীতের কামড় এত তীব্র হওয়ার কথা নয়।

ধীরে ধীরে নিজের আসন থেকে উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন আচার্য। শিনজের জন্য বুকটা মুচড়ে উঠছিল তাঁর। ভয়াল দর্শন সারমেয়টিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তিনি।

গুরুর আদেশে কয়েক বছর আগেই একবার তিব্বতে যেতে হয়েছিল তাঁকে। তিব্বতের রাজনীতিতে এখন উথালপাথাল চলছে। পোন ধর্মাবলম্বী সামন্তচক্র এবং বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী সম্রাটের মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রাম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। সম্রাট মে অগছোমের সঙ্গে তাঁরই মহামন্ত্রী মাশাং-এর বিরোধিতার কাহিনি মোটামুটি সবাই জানে। পোতালা প্রাসাদের আনাচেকানাচে এখন শুধু ষড়যন্ত্র আর অভ্যুত্থানের গন্ধ।

বৌদ্ধ আচার্য সেই সূত্রে গিয়েছিলেন সেদেশে। সম্রাট মে অগছোম তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পোতালা প্রাসাদে, সঙ্গে ছিল সমগ্র তিব্বত ঘুরে দেখার আহ্বান। বলা বাহুল্য, ঘোষিত উদ্দেশ্যের পেছনে একটি গোপন উদ্দেশ্যও ছিল। সম্রাট চেয়েছিলেন তিব্বতের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধ অনুরাগীদের নিয়ে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে। যারা প্রয়োজনের সময় সম্রাট এবং ভারতীয় বৌদ্ধপন্থীদের সাহায্য করবে।

সেই সফর সেরে ফেরার পথে ভারত তিব্বত সীমান্তবর্তী শেষ যে গ্রামটিতে এক পক্ষকাল অতিবাহিত করেন তিনি তার নাম দ্রোমো। সেখানকারই বাসিন্দা ছিল থুবতেন, আর শিনজে। শিনজে'কে সেখানেই প্রথম দেখেন তিনি।

রাজবাড়িতে জীবন কাটালে কী হবে, আচার্য রাহুলবজ্র প্রকৃতপক্ষে নিজে একজন অনাথ। তাই অন্য কোনো অনাথ মানুষ দেখলে তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন তিনি। থুবতেন নামের এই নিঃসহায় দরিদ্র যুবকটির সঙ্গে তিনি দ্রুত আলাপ জমিয়ে ফেলেন। ভাষা অন্তরায় হয়নি একেবারেই। তিব্বত ভ্রমণের প্রথম কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি সেই দেশের ভাষা আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন যে!

প্রথম থেকেই রাহুলবজ্র লক্ষ করেছিলেন যে থুবতেন ভালোবাসার কাঙাল। শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন সে, তারপর আর কারও কাছ থেকে সেভাবে স্নেহ ভালোবাসা পায়নি। তাই তার বুভুক্ষু ও অতৃপ্ত হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসাটুকু ঢেলে দিয়েছে তার কুড়িয়ে পাওয়া পোষ্যটির ওপর।

সারমেয়টিকে প্রথমে দেখে ভয়ই পেয়েছিলেন আচার্য রাহুলবজ্র। অমন সিংহসদৃশ সারমেয় জীবনে আর দুটি দেখেননি তিনি। তবে তিনি নিজেও অসীম সাহসী মানুষ, বিবিধ কলাকুশল ও জাদুবিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম। লোকে বলে তন্ত্রসাধনায় ঐশ্বরিক সিদ্ধি আছে তাঁর। তিনি নিজেও জানেন যে কথাটা সর্বাংশে মিথ্যে নয়।

তাই থুবতেনের পোষ্যটির সঙ্গে ভাব জমাতে তাঁর দেরি হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন, এই বিশাল জীবটিও তার প্রভুকে কতটা ভালোবাসে। সারমেয়দের প্রভুভক্তি সম্পর্কে তিনি সম্যকরূপে অবগত, কিন্তু এই নিঃসম্বল তরুণ আর অনাথ প্রাণীটির মধ্যে ভালোবাসার যে অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, তেমন আশ্চর্য সম্পর্ক কমই দেখেছেন তিনি।

আজ যে মুহূর্তে থুবতেন তাঁর সামনে শিনজের কর্তিত মস্তকটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, সেই মুহূর্তেই টের পেয়েছিলেন তিনি, ভালোবাসার উন্মাদনা কোন চরম পর্যায়ে গেলে এই কাজ করা সম্ভব। থুবতেনকে দেখে

বোঝা যাচ্ছিল, ভেতরে-ভেতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে সে। শুধুমাত্র ক্লান্তি নয়, এক উদাসীন ও লক্ষ্যহীন অবসাদ প্রতি মুহূর্তে নিংড়ে নিচ্ছে তাকে।

রাহুলবজ্র এও বুঝেছিলেন যে ভয়ঙ্কর কোনও অপরাশক্তির আধার তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করেছে থুবতেন। বস্তুটি দেখামাত্র তাঁর শরীরের প্রতিটি রোম খাড়া হয়ে গেছিল। চৈতন্যের প্রতিটি তন্ত্রী টানটান হয়ে তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে সংকেত পাঠাচ্ছিল, সাবধান! তাঁর সামনে যেটি রাখা আছে সেটি একটি ঘোর অমঙ্গল বস্তু।

'আপনি তো সব পারেন প্রভু। পারেন না? সত্যি কথা বলুন, পারেন না আমার শিনজেকে বাঁচিয়ে তুলতে?' মানুষ যে শুকনো গলা নিয়েও কাঁদতে পারে, সে কথা এই প্রথম অনুভব করলেন আচার্য।

থুবতেনের মাথার ওপর জমাট বাঁধছিল একদলা কালো ছায়া। একবার সেদিকে তাকালেন রাহুলবজ্র। তারপর তাকালেন তাঁর সামনে রাখা বিশাল আকারের করোটিটির দিকে। তার রঙ ঘোর কালো।

ফিসফিস করে বললেন মহাস্থবির, 'না রে থুবতেন, তা আর সম্ভব নয়। কারণ ও আর শিনজে নেই। ও এখন একটা পেতবত্থু।'

খেরি নঙ্গল। পাণিপথ। ১৯৫৯

রক্ত পড়ছিল লোকটার সারা গা থেকে, তবুও বিন্দুমাত্র টসকায়নি লোকটা। পাহাড়িদের সহনশীলতা একটু বেশিই হয়। তবে এর সহনশীলতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন রতনলাল।

সিলিং এ বাঁধা লোহার চেইন আর পুলি থেকে ঝুলছিল লোবসাং গিয়াৎসোর দেহটা। সারা শরীরে দগদগ করছে আগুনে সাঁড়াশির ছ্যাঁকার দাগ। লোহার কাঁটা লাগানো চাবুক দিয়ে ফালাফালা করে দেওয়া হয়েছে তাঁর পিঠ। উপড়ে নেওয়া হয়েছে দুপায়ের সব নখ, বাঁ-চোখের নীচে একটা মস্ত বড় ক্ষত হাঁ করে আছে। টানা ইলেক্ট্রিক শক পেয়ে পেয়ে কালো হয়ে আছে অণ্ডকোষদুটো।

তবুও, রতনলালের প্রশিক্ষিত হায়েনার গ্যাং-এর পাশবিক অত্যাচার সহ্য করেও, একটা কথাও বার করা যায়নি লোকটার মুখ থেকে। একটা আওয়াজ অবধি করেনি লোকটা, সামান্য উফ অবধি শোনা যায়নি। কিছুতেই ওকে দিয়ে বলানো যায়নি যে কোথায় রাখা আছে রিন পো চে'র নিজের হাতে লেখা সেই পুঁথি, পঞ্চজ্ঞানমঞ্জুশ্রীর অন্যতম রত্নটি।

মুশকিল হচ্ছে যে রতনলালের আজই জানতে হবে কার হাতে আছে সেই মহামূল্যবান পুঁথি। লোকটা তাঁর থ্রু দিয়েই আই বি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো বটে। কিন্তু তাঁকে না জানিয়েই যে দুম করে দিল্লি চলে যাবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। রতনলাল তো আশ্বাস দিয়েইছিলেন যে একটা শুভদিন দেখে লোবসাংকে উনিই নিয়ে যাবেন আই বি'র সদর দপ্তরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রতনলাল। লোকটা হুট করে এই কাজটা করে না বসলে আজ এত হাঙ্গামা হুজ্জতের দরকারই হতো না। আর যদি পুঁথিটা আই বি'র প্রধান ভোলানাথ মল্লিক, ওরফে ক্যাপ্টেনের হাতে পড়ে, তাহলে কথাই নেই। ও জিনিস উদ্ধার করা অসম্ভব। বাঙালির বাচ্চাটা যেমন ধুরন্ধর, লোকটার দেশের প্রতি আনুগত্যও তেমনই প্রশ্নহীন। যদি পুঁথিটা এখনও এই লোবসাং বা ওই মেজর শর্মার হাতে থাকে তো তাও একটা ক্ষীণ আশা আছে ওটা উদ্ধার করার।

আর সেটা না করতে পারলে যেটা হতে পারে সেটা ভাবতেও ঘাম ছুটে যাচ্ছিল রতনলালের। হিজ হোলিনেসের আদেশ পালন করাটাই মহাকালচক্রের একমাত্র কাজ। এর কোনও ব্যত্যয় হওয়া মানে হিজ হোলিনেসের হাজার বছরের প্রাচীন ডিক্রি অমান্য করা। মহাকালচক্রের কোনও সদস্যের পক্ষে এই আদেশ অমান্য করা আর স্বয়ং যমরাজকে দ্বৈরথে আহ্বান জানানো একই ব্যাপার।

তবে রতনলালের মাথার মধ্যে ক্রমাগত একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগিয়ে রেখেছিল লোকটার দৃষ্টি। অমানুষিক মার খেতে খেতেও একটা অদ্ভুত পাথুরেদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল এই তিব্বতিটা। সেই দৃষ্টিতে মার খাওয়ার যন্ত্রণা যতটা না ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল অন্য একটা বোধ।

ঘেন্না। বিশ্বাসঘাতকের প্রতি সমস্ত অস্থিমজ্জা রক্তঘাম উজাড় করে দেওয়া ঘেন্না। সমস্ত অসহায় ক্রোধ বমি করে দেওয়া ঘেন্না।

এখন ঘরে কেউ নেই। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে রতনলালের পোষা হিংস্র হায়েনার দল বাইরে একটু বিশ্রাম নিতে গেছে। অল্প হাওয়ায় দুলছে লোবসাং-এর ঝুলে থাকা রক্তাক্ত শরীরটা, আর রক্তভেজা কষ বেয়ে চুঁইয়ে নামছে একটা অদ্ভুত হাসি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু শিরশির করে উঠল পোড় খাওয়া এজেন্ট রতনলালের শিরদাঁড়াটা।

'ভাউ।'

চমকে উঠল রতনলাল। মারাঠিতে ভাউ মানে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই। এই নামে ডাকতে একসময় রতনলালই শিখিয়েছিলেন লোবসাংকে। দুজনের মধ্যে তরল ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় লোবসাং ভাউ বলেই ডাকতো রতনলালকে।

আর আজ এই রক্তাক্ত হিংস্র মধ্যরাতে এই ভাউ ডাকটা যেন লোবসাং-এর ভাঙা চোয়ালের মধ্য থেকে গায়ে কাঁটা দেওয়া এক অপার্থিব অশরীরী ফিসফিস হয়ে ভেসে এল।

'মেরা নাহানা হো গ্যায়া ভাউ। খানা খানে নেহি চলোগে? হি হি হি...'

ঘাড়ের সমস্ত রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল রতনলালের।

খানিকক্ষণের নৈঃশব্দ। শুধু লোহার চেনের টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে। আর লোবসাং এর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ার টুপটাপ শব্দ।

'উস কিতাব কে বারে মে জাননা চাহতে হো ভাউ?' ফিসফিস করে বলে উঠলেন লোবসাং, 'জাননা চাহতে হো উসমে ক্যায়া লিখখা হ্যায়?'

চিত্রার্পিতের মতো সেদিকে চেয়ে রইলেন রতনলাল।

'তো ফির পুরা সুনো ভাউ, ধ্যান সে সুননা। হাম বাতাতে হ্যায় উস কিতাব মে কেয়া লিখখা হ্যায়। বাদমে ইয়ে মত বোলনা কে আপকা ভাই লোবসাংনে আপকো কুছ নেহি বাতায়া... খি খি খি খি...'

মধ্যরাতের অন্ধকারে সিলিং থেকে নেমে আসা লোহার চেনে বাঁধা অবস্থায় দুলছে একটা শীর্ণকায় রক্তাক্ত নগ্ন শরীর। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে, ভূতুড়ে গলায় বলা কথাগুলো শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যেতে লাগল আই বি'র এজেন্ট, তথা মহাকালচক্রের গোপন সদস্য রতনলাল বাবুরাও মাত্রের পা দুটো।

দেড়হাজার বছর আগে

'প্রেতবস্তু বলতে তুই কী বুঝিস থুবতেন?'

ঘন অন্ধকার রাতে, বিহারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীটির পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দু'জন। যে মশাল এই অন্ধকার রাত্রিতে তাঁদের পথ দেখিয়ে এনেছে, সেটি প্রোথিত ছিল সামনের মাটিতে। তার আলোতে মাটিতে সদ্য-সদ্য আঁকা অষ্টভুজ ক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত। সেদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আচার্য রাহুলবজ্র, ওরফে প্রভু পদ্মসম্ভব।

'খুব অল্পই বুঝি প্রভু।' নিরাসক্ত স্বরে বলে থুবতেন 'যার ভেতরে কোনো প্রেতাত্মাকে লুকিয়ে রাখা হয়। যার জন্য এই প্রেতবস্তু বানানো হয়, তার সর্বনাশ ঘটে, সে সবংশে নিহত হয়।'

কথাটা পদ্মসম্ভবের কানে গেল কি না বোঝা গেল না। ধীরে-ধীরে অষ্টভুজ ক্ষেত্রটিকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে পূর্ব থেকে শুরু করে দক্ষিণ হয়ে পশ্চিমপ্রান্ত ছুঁয়ে উত্তর দিকে এলেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে সমগ্র ক্ষেত্রটিকে দেখলেন তিনি। তারপর সঙ্গে আনা পেটিকাটি খুলে চেয়ে রইলেন ভেতরে রাখা করোটিটির দিকে।

'শিনজে কি প্রেত হয়ে গেছে প্রভু?' নির্জীব স্বরে প্রশ্ন করে থুবতেন, 'শিনজের প্রেত কি আমাকে মেরে ফেলবে? তাহলে কি শিনজের সঙ্গে আমার ফের দেখা হতে পারে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আচার্য পদ্মসম্ভব। যা ভয় করছিলেন তাই হতে চলেছে। উন্মাদ হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে থুবতেনের আচরণে।

'শোন থুবতেন।' গম্ভীর মুখে বলেন পদ্মসম্ভব, 'তোর মনিব আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এক অতি শক্তিশালী, অতি ভয়ঙ্কর প্রেতবস্তুর জন্ম দিয়েছে। এই বিশেষ প্রেতকায়া নির্মাণের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কোনও হিংস্র পশুর জীবনীশক্তি। সেইজন্যই তারা হত্যা করেছে শিনজেকে।

তোর শিনজে আর সে শিনজে নেই রে থুবতেন। এখন সে এক হিংস্র প্রেতশক্তি মাত্র। তার বোধ নেই, বিবেক নেই, দৃষ্টি নেই। সে শুধু জানে মৃত্যুর করাল ছায়া বিছিয়ে দিতে। জেনে রাখ থুবতেন, যতদিন এই প্রেতবস্তু পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াবে ততদিন তোর, আমার, আমাদের কারও জীবনই আর নিরাপদ নয়।'

বোবা চোখে থুবতেন তাকিয়ে রইল আচার্য পদ্মসম্ভবের দিকে।

'এই প্রেতবস্তুকে রোধ করা আমাদের আশু কর্তব্য থুবতেন। এখনও সে জাগ্রত হয়নি। আমার ধারণা আজকালের মধ্যেই তার প্রেতচিত্ত সক্রিয় হবে।'

'তারপর?' নিস্তেজ গলায় প্রশ্ন করে থুবতেন।

'তারপর?' চাপা গলায় বললেন পদ্মসম্ভব, 'তারপর এক ভয়াবহ, অপ্রতিরোধ্য মহামার নেমে আসবে প্রকৃতির বুকে। একের পর এক মৃত্যু ঘটবে মানুষের। মারীতে উজাড় হয়ে যাবে গ্রামের পর গ্রাম। অপঘাতে মৃত মানুষের প্রেতদল পাতাল থেকে তুলে আনবে মহানরক। বজ্রখড়গ আর নরকপাল হাতে নেমে আসবেন দেবী চামুণ্ডা স্বয়ং। একবার যদি এই প্রেতকায়ার মুক্তি ঘটে, তাহলে মহা সর্বনাশ। তখন তাকে প্রতিরোধ করা স্বয়ং ঈশ্বরেরও অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।'

অস্ফুটে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে থুবতেন, 'তাহলে?'

চিন্তিত দেখায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তন্ত্রবেত্তাকে। অন্যমনস্ক স্বরে বলেন, 'সাধারণ কোনো উপায়ে এই প্রেতবস্তুর বিনাশ সম্ভব নয় থুবতেন। যে মন্ত্রবীজের দ্বারা এই প্রেতবস্তুর অন্তর্কায়া নির্মিত তা এই দেশের নয়। একমাত্র পোন পুরোহিতরাই এই প্রেতবন্ধনমন্ত্রে সিদ্ধ। আর যতদিন এই বন্ধন বজায় থাকবে, ততদিন শিনজে'র আত্মার মুক্তি নেই। অনাদিকাল পর্যন্ত সে এই প্রেতচক্রের অধীন হয়ে থাকবে। নরকের অগ্নি অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে তার বুকে। এই বীভৎস প্রেতদেহ থেকে তার পরিত্রাণ নেই, তার মুক্তি নেই, তার উদ্ধার নেই।'

'কিন্তু... ওরা যে আমাকে বলেছিল, আপনি নাকি জীবন্ত অবলোকিতেশ্বর?' থুবতেনের ক্লান্ত বিবর্ণ চোখদুটির কোণে জেগে ওঠে দু'টি অশ্রুকণা। 'আপনি পারেন না প্রভু? পারেন না শিনজেকে উদ্ধার করতে? আমি ছাড়া যে ওর আর কেউ নেই প্রভু।'

চোখদু'টি বন্ধ করলেন পদ্মসম্ভব। হায় তথাগত, কী ঐশ্বর্যই না তুমি দিয়েছ এই অনাথ যুবককে! এক অবলা পশুর প্রতি এত প্রেম কে কবে দেখেছে জগতে?

করুণাঘন চোখে থুবতেনের দিকে তাকালেন পদ্মসম্ভব। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'উপায় আছে থুবতেন। একটি উপায় আছে একে নিবৃত্ত করার। তবে সে বড় কঠিন, বড় দুরূহ। বড় জটিল বিদ্যা। মাত্র গুটিকতক মানুষই এর অধিকারী। শুধু তাই নয়, বিগত পাঁচশো বছরের মধ্যে কখনও এর প্রয়োগও হয়নি। এর

বিন্দুমাত্র ভুল প্রয়োগে মহাসর্বনাশ উপস্থিত হতে পারে। উল্টে যেতে পারে প্রকৃতির নিয়মকানুন, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আমাদের চেনা এই জগৎ।'

'কী সেই বিদ্যা, প্রভু?'

স্থিরদৃষ্টিতে থুবতেনের দিকে তাকিয়ে থাকেন পদ্মসম্ভব, তারপর গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করেন একটিমাত্র শব্দ, 'কালচক্র নির্মাণ।'

এরপর দুজনেই একটু চুপ করে থাকেন। আকাশে ঝুলে থাকা চাঁদের ক্ষীণ টুকরোটি নির্বাক শৈত্যের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে এই পাহাড়ি উপত্যকার দিকে, তার বুক চিরে চলে যাওয়া নদীটির দিকে, বৌদ্ধবিহারটির সংলগ্ন ছোট গ্রামটির দিকে। মনে হয় শীতল ধাতব আলো যেন এক অপার্থিব স্তব্ধতার চাদর বিছিয়ে রেখেছে এই উপত্যকার উপর।

'শাম্ভালার সম্রাট কালধর্মরাজ সুভদ্রর আশীর্বাদে মহান কালতন্ত্রবিদ্যা আমার অধিগত।' পদ্মসম্ভবের গম্ভীরস্বর ধ্বনিত হয় আদিগন্ত নিসর্গ জুড়ে, 'আজ আমি এই অতি গুহ্য, অতি শক্তিশালী, অতি জটিল বিদ্যার প্রয়োগ করব। এই প্রেতবস্তুকে আজ আমি এমন গহীন গহ্বরে লুকিয়ে রাখব যাতে অন্তত সহস্রাধিক বৎসরের জন্য এ হারিয়ে যায়।'

'কোথায় লুকিয়ে রাখবেন ভন্তে?' উদ্বেগে আর ভয়ে স্বর কেঁপে যায় থুবতেনের।

তার প্রশ্নের উত্তর দেন না পদ্মসম্ভব, গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'এখন তুই গ্রামে ফিরে যা থুবতেন। গিয়ে ঘরে-ঘরে বলে দিস কেউ যেন আজ রাতে ঘরের বাইরে না থাকে। জানিয়ে দিস, এটি আচার্য পদ্মসম্ভবের কঠোর নির্দেশ।

আজ রাত্রে প্রবল প্রলয় আছড়ে পড়বে এই জনপদ ঘিরে। তখন যদি পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যায়, নগাধিরাজ হিমালয় চূর্ণ হয়ে যায়, দাবানল গ্রাস করে এই ভূমি, তবুও যেন একটি প্রাণীও ঘরের বাইরে পা না রাখে। ভয়ের কিছু নেই, আমার কর্ম সুসম্পন্ন হলে সব কিছু পূর্ববৎ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোনোভাবেই, কিছুতেই যেন একটি প্রাণীও আজ ঘরের বাইরে না আসে।'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল থুবতেনের। 'আজ রাতে কী হবে ভন্তে?' জানতে চাইল সে, 'এমন আদেশের মানে কী? কোন সে অন্ধকার গহ্বরের কথা বলছেন আপনি?'

খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন পদ্মসম্ভব। অনিমেষ অনন্ত আকাশের আঁচলে উজ্জ্বল হীরকচূর্ণের মতো ছড়িয়ে আছে অনিঃশেষ নক্ষত্রপুঞ্জ। সেদিকে তাকিয়ে চোখদুটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ করলেন তিনি।

'শোন রে থুবতেন, আজ আমি এই অষ্টভুজক্ষেত্রে নির্মাণ করব কালচক্রমণ্ডল। অষ্ট দিকপাল রক্ষা করবেন এর প্রতিটি বাহু। অন্তর্দেহ রক্ষা করবেন ষড়ভুজ মহাকাল। মূলচক্র বীজ স্থাপন করব দেবী শ্বানাস্যাবাকুক্কুরমুখী'র নামে। আর তারপর...' লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন পদ্মসম্ভব, 'এরপর গুরুর আশীর্বাদে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করব স্বয়ং মহাকালকে।'

যেন এক ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল থুবতেন। তাও সে প্রশ্ন করল, 'তাতে কী হবে প্রভু?'

'সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার লক্ষ্য হবে দেব মহাকালকে ক্ষণমাত্রের জন্য হলেও পরাস্ত করা। যে অনাদি, অনন্ত সময়প্রবাহ আমাদের ঘিরে বয়ে চলেছে, গুরুদত্ত তন্ত্রজ্ঞানে তার দেহে একটি রন্ধ্রপথ সৃষ্টি করব। উন্মুক্ত করব সময়ের সিংহদ্বার, কালজঠর। তখন বিপুল বিক্ষোভে পৃথিবী আন্দোলিত হবে, আকাশ হতে উৎক্ষিপ্ত হবে নক্ষত্রসমূহ, রুষ্ট মহাকালের পাশদণ্ড আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। তারই মধ্যে, মুহূর্তের জন্য উন্মুক্ত হবে সেই রন্ধ্রপথ, আর সেখানেই আমি নিক্ষেপ করব এই প্রেতবস্তু। তারপরেই রুদ্ধ হয়ে যাবে সেই কালরন্ধ্র, হারিয়ে যাবে এই মূর্তিমান পাপ।'

'আর শিনজে? তার মুক্তি হবে না?' কোন পাহাড়ি ঝরনা যেন নেমে এলো অনাথ, অসহায়, নিঃসম্বল যুবকের দু'চোখের শুকনো গিরিখাত বেয়ে, 'ওকে ছাড়া আমি যে নরকে গিয়েও শান্তি পাবো না প্রভু। আমি

ছাড়া ওর যে আর কেউ নেই। পশু বলে কী আপনার করুণাস্পর্শের অধিকার নেই তার? বলুন প্রভু, আপনার ধর্ম কী শুধু মানুষের জন্য?'

কঠোর হৃদয় তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ তিনি, অসম্ভব সব আধিদৈবিক ও অলৌকিক কার্যকলাপে তাঁর প্রসিদ্ধি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষব্যাপী। তবুও এই মুহূর্তে এক অনির্বচনীয়ভাবে হৃদয় দ্রব হল পদ্মসম্ভবের।

'হবে রে বাছা, হবে।' থুবতেনের মাথায় হাত রেখে বললেন পদ্মসম্ভব,'এই বন্ধনের আয়ুষ্কাল সহস্রাব্দের কিছু অধিকমাত্র। তারপর দৈবের অমোঘ নিয়মে তোর আর শিনজের সাক্ষাৎ হবে। আমি তোকে লিখে দিয়ে যাব এই বন্ধনমোচনের উপায়। দৈবের নির্বন্ধে তোর কোনও উত্তরপুরুষ বা তার পরমবান্ধব জাগ্রত করবে এই মহাকালবন্ধন।

সেইদিন অবধি যেন এই অতীব গোপন আদেশ সযত্নে রক্ষা করে তোর উত্তরপুরুষেরা।

তারপর কোনও এক ঐশী উপায়ে উন্মুক্ত হবে সময়ের দ্বার। আমি জানি না কীভাবে সম্ভব হবে সেই অসম্ভব ঘটনা। তবুও বলছি হবে রে থুবতেন, হবে। তোর সঙ্গে শেষবারের মতো সাক্ষাৎ হবে শিনজের, আর তদ্দণ্ডেই উদ্ধার হবে সে। এইখানেই ঘটবে সেই ঘটনা, এই অষ্টভুজক্ষেত্রেই। জীবনমৃত্যুর আবর্তনে আবার জন্ম নিবি তুই। তখন তোর সঙ্গে আবার তার দেখা হবে, হবে, হবেই!'

আট মাস আগে

দৈত্যের মতো বিশাল বড় এক্সক্যাভেটার আর বুলডোজারগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল একপাশে। অন্যপাশে বড় বড় যন্ত্রচালিত চেইনস' আর ক্রস কাট স' নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করছিল একদল মানুষ। একটু দূরে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে ডায়না নদী। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার ছলাৎছল জল মৃদু গর্জনের শব্দ তুলছিল। মাথা তুলে তাকালে দেখা যায় যে একটু দূরেই ভুটানের পর্বতমালা। সেখান থেকে ভারী মোলায়েম ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসছিল।

যন্ত্রপাতিগুলো ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল বস্তির মেয়েমদ্দ আর বাচ্চাদের দল। এমন নয় যে এই এলাকায় আগে এসব যন্ত্রপাতি তারা কখনও দেখেনি। গত দশ বছরের মধ্যেই এদিক-ওদিক করে দেখতে দেখতে বেশ ক'টা রিসর্ট গড়ে উঠেছে এই লাল ঝামেলা বস্তির কাছে-পিঠেই। শহরের বাবুবিবিরা সেখানে প্রতি সপ্তাহান্তে পরের বর অথবা বউ নিয়ে এসে ঘোরতর মোচ্ছব মেহফিল উদযাপন করে যান। তা সেসব শৌখিন রিসর্ট বানানোর সময়েও তো কাজকম্ম, হই হট্টগোল এসব কম হয়নি। তাহলে এখন এদের এত উৎসাহিত হওয়ার কারণ কী?

তার কারণ একটাই। এই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোর মতো রাক্ষুসে জিনিস আর আগে কখনও এই চত্বরে ঢোকেনি, এ কথা হলফ করে বলতে পারে এখানকার লোকজন।

'এবার এই এখানেও আবার হোটেল মোটেল তৈরি হবে নাকি রে অভিরাম?' নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে এলাকার উঠতি নেতা অভিরাম বেসরার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল বুড়ো ভগত মাঝি।

মুখখানা তুম্বো করে সেদিকে তাকিয়েছিল অভিরাম বেসরা। বুড়োর কথার উত্তর দিল না সে। মেজাজটা তার বড্ড টকে আছে।

তার মেজাজ টকে থাকার কারণও আছে অবশ্য। এই এলাকায় এত বড় একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, তাও আবার তাকে না জানিয়ে, ব্যাপারটা ঠিক হজম হচ্ছিল না তার। নাগরাকাটা থেকে দেবপাড়া হয়ে বানারহাট, এই টোটাল এরিয়ায় যত প্রজেক্ট হবে, তার ইট বালি সাপ্লাইয়ের টেন্ডার তার একার, এ হচ্ছে চন্দ্র-সূর্য উদয় অস্তের মতোই বাঁধা নিয়ম।

অবিশ্যি তার একার টেন্ডার কথাটা ভুল, এই এলাকার এম এল এ পালবাবুর জন্য কুড়ি পার্সেন্ট আলাদা করে রাখাই থাকে। আজ অবধি এ নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয়নি।

হল আজ।

তাকে না জানিয়েই জঙ্গল সাফা হচ্ছে শুনে গতকাল সকালে সাইটে লোক পাঠিয়েছিল অভিরাম। লোক বলতে বাবলু আর ট্যারা নিতাই। দুজনেই বলিয়ে কইয়ে লোক, চেম্বার ছাড়া ঘোরে না। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর দুপুরের মধ্যেই কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোকজন হেঁ-হেঁ করতে করতে তার দরবারে এসে উপস্থিত হয়। একটু তেড়িয়া পার্টি হলে বিকেল। তারপর বাকিটা মাল্লুর বখরা নিয়ে নেগোসিয়েশন। তবে এসব ক্ষেত্রে অভিরাম বড়ই নির্মম। পালবাবুর রেকোমেন্ডেশন নিয়ে এলে আলাদা কথা, নইলে এসব ব্যাপারে সে পাই পয়সা ছাড়ে না কাউকে।

গতকাল দুপুরে ওর বাড়ির সামনে বাবলুর বাইক দাঁড় করানোর শব্দ শুনেই বারমুডার ওপর একটা টি শার্ট চাপিয়ে বেরিয়ে এসেছিল অভিরাম। তখনই হাফ বোতল হুইস্কি তার পেটে। কিন্তু বেরিয়ে আসার পর তার নেশা কাটতে দেরি হয়নি বেশি।

দুটোকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ওদের ওপর দিয়ে ছোটখাটো একটা ঝড় বয়ে গেছে। মারটা নিতাই-ই খেয়েছে বেশি। ঠোঁটের কষ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, বাঁ-চোখটাও ফোলা। গাল দুটোও ফুলে রয়েছে বীভৎসভাবে। বরং বাবলুর ধোলাইটা কমই হয়েছে একটু। ওকে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে বাইকটা ঠিকঠাক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

'তোদের কে মারল এইভাবে?' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জানতে চেয়েছিল অভিরাম। তার লোকের গায়ে হাত তোলে, এই এলাকায় কার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

প্রজেক্টের সিকিউরিটির লোকজন। এই উত্তরই এসেছিল কোঁকাতে থাকা বাবলুর কাছ থেকে।

ওয়েবলি স্কটটা লোড করে বাইক স্টার্ট দিয়েছিল অভিরাম। প্রজেক্ট পরে, আগে থানায় যাওয়াটা দরকার। শুয়োরের বাচ্চা বড়বাবুটার সঙ্গে একটা মহড়া নেওয়া খুব জরুরি। শান্তিপূর্ণভাবে তোলা আদায় করার জন্য সিন্ডিকেটের লোকজনকে যদি এভাবে প্রকাশ্যে মার খেতে হয়, তাহলে মাসে মাসে থানায় মাসোহারাটা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কেন?

প্রবল রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে থানায় পৌঁছে অভিরাম আরও অবাক। বড়বাবু হাসানসাহেব রাতারাতি বদলি হয়ে গেছেন। তার বদলে কে এক মুখুজ্জে না চাটুজ্জে থানার চেয়ারে বসে।

এসব ক্ষেত্রে অভিরাম সচরাচর ধীরে চলো নীতি নেয়। মানে আগে আলাপ পরিচয় হোক, ভাব ভালোবাসা হোক। তারপর না হয় সেটিং এ আসা যাবে। ম্যারিনেট না করেই মুরগি রাঁধতে যায় কোন আহাম্মক? তাতে টেংরির টেস্ট খারাপ হয় না?

কিন্তু দামি হুইস্কির প্রভাবেই হোক বা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে থাকার কারণেই হোক, প্রথমেই একটু রঙ নিতে গেছিল অভিরাম।

ভগত খুড়োর প্রশ্নটা শুনে বাঁ-গালে নিজের অজান্তেই হাতটা চলে গেল অভিরামের। গালটা এখনও টনটন করছে ব্যাথায়। কানের ভোঁ-ভোঁ-টা অবশ্য অনেকটাই কমেছে, খালপাড়ের বস্তির মালতীর চুন হলুদের দৌলতে। তবে অপমানের জ্বালাটা এখনও কমেনি অভিরামের। এই এলাকার বেতাজ বাদশা সে। তাকেই কিনা কানের গোড়ায় থাবড়ে দেয় থানার নতুন বড়বাবু?

অপমানটা গায়ে আরও বিঁধে রয়েছে সাতসকালে পালবাবুর ফোন পাওয়ার পর। যে লোকটা আজ অবধি 'মেরা বাচ্চা, মেরা শের' এইসব বলে তোল্লাই দিয়ে এসেছে ওকে, আজ তারই গলার স্বর সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু স্বর? আর বাকি খিস্তিগুলো?

'জানি না খুড়ো, হবে কিছু একটা।' তিক্তস্বরে উত্তর দিল অভিরাম, কাল থেকে কী যে হচ্ছে সেটা এখনও মাথায় সেঁধোয়নি তার। সকালে পালবাবু ফোন তুলেই বলেছিলেন, 'বাঞ্চোত, আমার সঙ্গে কথা না বলে

তোকে কে বলেছিল ওখানে রংদারি করতে যেতে? কীসের প্রজেক্ট জানিস কিছু?'

মিউমিউ করে কিছু একটা বলতে গেছিল অভিরাম। এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দেন পালবাবু, তারপর গলা নামিয়ে বলেন, 'এই প্রজেক্ট থেকে একশো হাত দূরে থাক অভিরাম। এ অনেক ওপরের লেভেলের ব্যাপার, তোর মতো খুচরো ছুঁচোদের কাজ কারবার না। যদি তুই বা তোর টেনিয়াদের কেউ ওদিকে পা রেখেছে, তোদের লাশ অবধি খুঁজে পাওয়া যাবে না, কথাটা যেন মাথায় থাকে তোদের, এই বলে দিলাম, হুঁ।'

ল্যাবে বসে হাই তুলতে তুলতে বেহুদ্দ বোর হচ্ছিল সুজন। জেনিভা থেকে দুদিন আগেই কলকাতা ফিরেছে ও, এখনও ভালোভাবে জেট ল্যাগ কাটেনি। তার মধ্যেই ল্যাবে ডিউটি দেওয়ার জন্য আসা।

যে কাজে গেছিল সুজন সেসব ভালোভাবে মিটে তার ওপর বেশ কিছু উপরি পাওনাও জুটেছে ওর। সার্নের ডেল্টা টিমের চিফ অ্যাডভাইজর প্রফেসর কাগুয়োচি স্বয়ং ওর পিঠ চাপড়ে বলেছেন পার্টিকল ফিজিক্সে সুজনের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। প্রফেসর কাগুয়োচি নোবেলজয়ী পদার্থবিদ, পার্টিকল ফিজিক্সে দুনিয়াজোড়া নাম। এহেন বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্টিস্টের টিমে কাজ করার আমন্ত্রণ পেয়ে সুজনের খুশি থাকারই কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো কারণে ওর মনমেজাজ বিতিকিচ্ছিরি রকমের টকে আছে।

খানিকক্ষণ দোনোমোনো করে চেয়ার থেকে ওঠার উদ্যোগ করছে, এমন সময় পিঠে একটা মোক্ষম চাপড় পড়ায় চমকে উঠল সুজন। তারপরেই ভেসে এল চড়া গলায় সুভাষিতানি, 'কী খবর বে? শুনছি প্রফেসর কানামাছিকে নাকি একেবারে পকেটে পুরে ফেলেছিস? কনগ্র্যাটস ব্রো। প্রফেসর মুখার্জি তো বলাই শুরু করেছেন যে সুজন ইজ আওয়ার নেক্সট নোবেল লরিয়েট। তা একদিন খাইয়ে টাইয়ে দে। পরে সেলেব্রিটি হয়ে গেলে তো তোকে আর ধরা ছোঁওয়া যাবে না।'

প্রাণের বন্ধু দেবাদিত্য ওরফে দেবুকে দেখে সুজনের মুখে একটা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটে উঠতে গিয়েও মিলিয়ে যায়। ম্লান মুখে বলে, 'মন-মেজাজ ভালো নেই ব্রো। ফালতু বকে ঝাঁট জ্বালাস না প্লিজ।'

সুজন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুটোতেই প্রথম পাঁচের মধ্যে র‍্যাঙ্ক ছিল ওর। হাওড়ার এক এঁদো গলিতে জন্মানো অসামান্য প্রতিভাবান ছেলেটিকে স্কুল কলেজের মাস্টারমশাইরা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁরাই সুজনকে বটগাছের মতো আগলে আগলে রেখে রেখে এতদূর পৌঁছে দিয়েছেন।

দেবাদিত্য'র গল্পটা আবার একেবারে উল্টো, একমাত্র রেজাল্টের ব্যাপারটা ছাড়া। সাউথ কলকাতার এক নামী ব্যবসায়ীর ছেলে সে, বাপের টাকার লেখাজোখা নেই। তার ওপর টানা-টানা চোখ, টকটকে ফরসা গায়ের রঙ, টিকোলো নাক আর নিয়মিত জিমে যাওয়া স্বাস্থ্যের অধিকারী এই ছেলেটি রূপে একেবারে রাজপুত্র। শুধু রূপে কেন, শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে সে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে মারকাটারি রেজাল্ট করেছে। তার গ্র্যাজুয়েশন ও মাস্টার্সের রেজাল্টও রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো।

দেবাদিত্য আর সুজন দুজনে নেট কোয়ালিফাই করা জুনিয়র রিসার্চ ফেলো। বছর দুয়েক আগে দুজনে একই দিনে সল্টলেকের সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে জয়েন করে। দুজনেই এক্সপেরিমেন্টাল পার্টিকল ফিজিক্স নিয়ে গবেষণারত।

প্রাণের বন্ধুর মনটা কোনো কারণে সত্যিই খারাপ বুঝে দেবু একটা অন্য রাস্তা নেয়।

'তা সামনে তো লং উইকেন্ড। কী করবি, কিছু ভেবেছিস?'

গোঁজ হয়ে বসে থাকে সুজন, উত্তর দেয় না। বোঝা যায় যে তার কোনো প্ল্যানই নেই।

'শোন ভাই,' আরও ঘন হয়ে আসে দেবু 'যদি তোর অন্য কোনো এনগেজমেন্ট না থাকে, আমার সঙ্গে চেংমারি টি গার্ডেন যাবি?'

'সেটা আবার কোথায়?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে সুজন, 'নাম শুনিনি তো।'

'আরে শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার হয়ে জয়গাঁও যাওয়ার পথে পড়ে।' হাত-পা নেড়ে বলতে থাকে দেবু, 'মালবাজার থেকে নাগরাকাটা। সেখান থেকে চেংমারি টি গার্ডেন আধঘণ্টার রাস্তা। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি থেকে যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। আমার ছোটমামা হল ওই চা-বাগানের ম্যানেজার, বুঝলি। একটা ব্রিটিশ আমলের দুর্দান্ত আউটহাউস আছে, পুরো ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। জায়গাটা ভুটানের গা ঘেঁষে। অসম্ভব টেস্টি দেশি মুরগি পাওয়া যায়, সঙ্গে কড়া ভুটানি হুইস্কি, আর চারদিকের সিনিক বিউটি দেখলে মাইরি পাগলা হয়ে যাবি।'

'বলছিস?' উৎসাহিত দেখায় সুজনকে, 'তা আমরা গেলে তোর মামার কাজেকর্মে কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

'আরে না-না!' সুজনের কাঁধে ইয়াব্বড় চাপড় মেরে আশ্বাস দেয় দেবাদিত্য, 'এখন তো চা পাতা তোলা বন্ধ আছে হপ্তাদুয়েকের জন্য। কাজ ফের শুরু হবে অক্টোবরের শেষে। মামা এখন ওখানে নেই, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় এসেছে।

তার মধ্যেই ওখানে কী একটা ছোট বাওয়াল হয়েছে নাকি। আমাকে বলল, 'চা বাগানের কুলিকামিনগুলো কী একটা নিয়ে একটু ভয়টয় পাচ্ছে। গিয়ে দেখে আয় তো বুবলা।' ব্যস! আমিও প্রস্তাবটা লুফে নিলাম। এমনিতেই ছোট বাগান, বেশি লোকলস্কর নেই, আর এখন তো ফাঁকা বললেই চলে। দিন তিন-চারেকের মামলা, যাব আর আসব।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজন। তারপর চোরা চাউনিতে দেবুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ফ্লাইটের খচ্চা তুই দিবি তো?'

দেবুর থাপ্পড়টা এড়াতে টেবিলের নীচে অনেকটা ডাক করতে হয় সুজনকে।

আট মাস আগে

জঙ্গলটা প্রায় আধাআধি সাফ হয়ে এসেছে। মেশিনচালিত বড় বড় চেইনস'গুলো এক একটা করে গাছ কাটছে, আর বুলডোজারগুলো সেসব গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে জমা করছে জঙ্গলের একপাশে। এসব গুঁড়ি পরে কাঠ চেরাই কলে যাবে। তারপর সেখান থেকে কাঠের কারখানায়।

বাচ্চাদের দল পড়ে থাকা ডালপালা কাঠকুটো দু-হাতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, জ্বালানি হিসেবে ঘরে মজুত করবে বলে। পাশেই ডায়না নদীর কোল ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা কোমর সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল। ঘাস কাটার জন্য বড় বড় হেঁসো নিয়ে নেমে পড়েছে একদল লোক। একনজরেই বোঝা যায় যে তারা এখানকার লোক নয়। সাধারণ ঘেসুড়েদের থেকে তাদের হাবভাব একেবারেই আলাদা।

একটা ঘোড়ানিম গাছের নীচে চেয়ারে বসে অলস ভঙ্গিতে চারিদিকে এসবই নজরে রাখছিলেন মধ্য চল্লিশের একজন মানুষ। ভালো করে চেয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তাঁর আপাত ঔদাসীন্যের আড়ালে একটা সতর্ক কাঠিন্য আছে। ছিপছিপে পেটাই চেহারা, সুগঠিত পেশি আর মুখে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাব দেখে বোঝা যায় যে ইনি যে সে সামান্য লোক নন। যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে একজন পেশাদার সেনাপ্রধান তাঁর সেনাদের গতিবিধি নজরে রাখেন, তিনিও সেভাবেই এই কর্মকাণ্ডটি পরিচালনা করছেন।

এমন সময়ে তাঁর পকেটে থাকা মোবাইল ফোন খড়খড় করে উঠল। মানুষটি মোবাইলটা বার করে স্ক্রিনটা একবার দেখতেই চেয়ার থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মোবাইলটা আড়াল করে জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে সরে গেলেন তিনি।

মিনিট পাঁচেক পর যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তাঁর চলাফেরা বদলে গেছে। একটু ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন ঘেসুড়েদের সর্দারের কাছে।

'কিতনা দিন লাগেগা ইয়ে সব সাফ হোনে মে?'

'অওর দস বারা দিন তো লাগেগা হুজুর।'

'অওর পাঁচ দিনকে অন্দর ইয়ে কাম খতম করনা পড়েগা। উপর সে অর্ডার আয়া হ্যায়। ক্যায়সে করোগে?'

'ইয়ে ক্যায়সে সম্ভব হোগা হুজুর? ইতনা বড়া জঙ্গল, অওর হাম সির্ফ পাঁচ লোগ...'

'ম্যায়নে আপসে ইয়ে পুছা হুঁ কে ইয়ে কাম ক্যায়সে হোগা। ম্যায়নে ইয়ে নেহি পুছা কি ইয়ে কিঁউ নেহি হোগা, সমঝে?' শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এল।

সেই প্রশ্নের সামনে যেন একটু কুঁকড়েই গেল ঘেসোদের সর্দার।

এই লোকটাকে সে ভয় পায়, বিলক্ষণ ভয়। লোকটা মারে না, ধরে না, বকাবকি করে না, আজ অবধি কেউ লোকটাকে গলা তুলে কথা অবধি বলতে শোনেনি। তবুও লোকটার মধ্যে কী যেন একটা আছে, সামনে এসে দাঁড়ালে গা'টা এমনিতেই একটু শিরশির করে ওঠে।

'অগর অওর দস লোগ মিল যাঁয়ে তো...'

'মিল জায়েগা। অওর?'

'প্যায়সা ভি থোড়া জ্যায়াদা চাহিয়ে হোগা।'

'উসকে লিয়ে চিন্তা মত কীজিয়ে। কাম বরাবর হোনি চাহিয়ে।'

'জি মালিক।'

লোকটি আদেশ দিয়ে চেয়ারের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে একজন ঘেসুড়েকে দৌড়ে আসতে দেখে থমকে গেলেন তিনি। তিনি এবং ঘেসুড়েদের সর্দার দুজনেই।

দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল অভিরাম। দৌড়ে আসা লোকটার ভাবভঙ্গিতে যে একটা উত্তেজনার ভাব ছিল সেটা নজর এড়ায়নি তার। লিডার গোছের লোকটাকেও সকাল থেকে নজরে রেখেছে সে। মালটার একটা আলাদা পার্সোনালিটি আছে, স্বীকার করতে বাধ্য সে।

স্থানীয় লোকজন এদিকে আস্তে আস্তে সরে পড়ছিল। সবারই বাড়ির কাজ আছে, তেল নুন লকড়ির লড়াই আছে, সারাদিন এখানে রঙ্গ দেখার জন্য পড়ে থাকলে চলবে? দু-একটা বাচ্চা অবশ্য এখানে থেকে যাওয়ার জন্য জেদ ধরেছিল, পিঠে দু'ঘা করে পড়তে তারাও বাড়ির রাস্তা ধরেছে।

একটা ঝুরি নামানো বটের আড়ালে সট করে সরে গেলো অভিরাম।

এখানে হচ্ছেটা কী? সে হচ্ছে গিয়ে এই এলাকার অবিসংবাদী দাদা, সে অবধি জানে না এ কীসের প্রজেক্ট, কেমন প্রজেক্ট, কোথাকার প্রজেক্ট!

এমনকী তার গডফাদার পালবাবু অবধি ঠিকঠাক কিছু জানাননি তাকে। কথাবার্তায় অন্তত এটুকু বুঝেছে সে যে পালবাবুও এ ব্যাপারে তার মতোই অন্ধকারে।

অভিরাম বেসরা পালবাবু নয়। তার একটা উচ্চাশা আছে, পলিটিক্সে তার একটা কেরিয়ার আছে। এখানে কী হচ্ছে সেটা ঠিকঠাক না জানলে তার পেটের ভাত হজম হবে না যে!

জঙ্গল থেকে দৌড়ে আসা লোকটা হাত-পা নেড়ে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে। কিছুক্ষণ পর লিডার গোছের লোকটা বাকি ঘেসুড়েদের চলে যেতে বলল।

অভিরাম কাঁটা হয়ে রইল। ফিরে আসা ঘেসোদের দল তাকে দেখতে পেলেই চিত্তির!

বটের ঝুরির মধ্যে আরও ঘন হয়ে সেঁধিয়ে গেল সে।

জায়গাটা ফাঁকা হওয়ার পর লিডার গোছের লোকটা, ঘেসুড়েদের সর্দার, আর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা সেই ঘেসো, তিনজনে মিলে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অভিরাম এদিক-ওদিক দেখে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। তারপর সম্পূর্ণ অন্য একটা রাস্তা ধরল সে। এই এলাকার ছেলে অভিরাম, তার ওপর অবাধ্য দামাল ছেলে বলে ছোটবেলা থেকেই তার একটা কুখ্যাতি ছিল। এই জঙ্গলের প্রতিটি সুঁড়িপথ, প্রতিটি গোপন আস্তানা, প্রতিটি ঝোপঝাড় তার চেনা। এবং সে যদি খুব ভুল না হয়, যদি তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে ভুল সংকেত না দিয়ে থাকে, তবে সে জানে যে ওরা কোথায় যাচ্ছে।

ওরা যাচ্ছে আটকোনার থানে। যেখানে ওদের যাওয়া বারণ। ভীষণভাবে বারণ।

*

চেংমারি টি গার্ডেনে যখন এসে পৌঁছয় সুজন আর দেবু, তখন প্রায় বিকেল। দেবুর মামার ইনোভাও সময়ের আগেই হাজির ছিল নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে। ড্রাইভার নেপালি, নাম বাজবাহাদুর থাপা। দেখা হতেই একগাল হেসে 'হামকো বাজু বুলাইয়েগা সা'ব' বলে ঝটপট ওদের লাগেজ ডিকিতে তুলে দেয় সে। ওরা যখন রওনা দিল তখন প্রায় এগারোটা।

করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে ওদলাবাড়ির রাস্তা ধরতেই ম্যাজিক! দুপাশে বিস্তীর্ণ চা বাগান। রাস্তার পাশে বড় বড় গাছেরা একে অন্যের ওপর ঝুঁকে তৈরি করেছে আশ্চর্য সুন্দর চাঁদোয়া। তারমধ্য দিয়ে দুপুরের রোদের মিষ্টি আলো পিচের রাস্তার ওপর পড়ে ঝিকিয়ে উঠছিল। দেবু এদিকটায় অনেকবার এসেছে, তবুও মুগ্ধ হয়ে দুপাশের দৃশ্য উপভোগ করছিল সে।

লাঞ্চটা ওরা সারল মালবাজারের টুরিস্ট লজের রেস্তোরাঁয়।

এখানেই দেবু প্রথমবারের জন্য লক্ষ করল লোকটাকে।

একই টেবিলে তাদের উল্টোদিকে বসে ছিল লোকটা। সাধারণ মধ্যবয়স্ক বাঙালি যেমন হয় তেমনই। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, মাথায় অল্প চুল, হালকা একটা ভুঁড়ি। পরনে একটা হাফ-হাতা শার্ট, ঢলঢলে ট্রাউজার আর চপ্পল। একঝলক দেখলেই নির্বিবাদী নির্বিরোধী বাঙালি ভদ্রলোক ছাড়া অন্য কিছু মনে হওয়া অসম্ভব। তবে দেবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্য একটা জিনিস।

ভদ্রলোক ভাতে ডাল মেখে খাওয়া শুরুর আগে বিড়বিড় করে কী একটা বললেন, তারপর প্রথম গ্রাস মুখে দিলেন।

'মন্ত্র বললেন নাকি?' খেতে-খেতে প্রশ্নটা সেই ভদ্রলোকের দিকে ছুঁড়ে দেয় সুজন।

ভদ্রলোক চিবোতে-চিবোতে এদিকে তাকিয়ে একটু অল্প হাসলেন। তারপর গ্রাস শেষ হলে খানিকটা লজ্জিতভাবে বলেন 'ওই আর কি। ছোটবেলার অভ্যেস, বাবা শিখিয়ে গেছিলেন। প্রথম গ্রাস মুখের দেওয়ার আগে...'

'খাওয়ারও মন্ত্র হয়? ইন্টারেস্টিং! মন্ত্রটা কী জানতে পারি?' প্রশ্ন করে সুজন।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন ভদ্রলোক, তারপর চাপা কিন্তু পরিষ্কার উচ্চারণে বলে ওঠেন, 'ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।'

'এটা...হজম হওয়ার মন্ত্র নয়তো?' সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করে দেবু।

লোকটা ধীরস্বরে বলে, 'না। হজমের মন্ত্র নয়। যে ব্রহ্ম থেকে এই মায়াময় বিশ্ব সৃষ্ট, যে ব্রহ্ম সর্বভূতে পরিব্যপ্ত, যে ব্রহ্ম আমাদের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ স্বরূপ, তাঁকে স্মরণ করা। ধরে নিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো, থ্যাঙ্কস গিভিং-এর মতো।'

একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রশ্ন করে সুজন, 'দাদা এখানকারই লোক নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই, চাকরিসূত্রে আপাতত এখানেই আছি। তুমি করেই বলছি, হ্যাঁ। দেখে মনে হচ্ছে তোমরা বয়েসে ছোটই হবে। কিছু মনে করলে না তো?'

'আরে না-না, মনে করার প্রশ্নই নেই। আমরা আপনার ভাইয়ের বয়সিই হব। স্বচ্ছন্দে তুমি বলুন। তা দাদার কী করা হয়?' খেতে-খেতে প্রশ্ন করে সুজন।

'এই সামান্য শিক্ষকতা করি আর কি। নাগরাকাটার একটা স্কুলে বাংলা আর সংস্কৃত পড়াই।'

'আচ্ছা! সংস্কৃতের টিচার। তাই আপনার উচ্চারণ এত ভালো।' তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা দোলায় দেবু।

'এ আর এমনকী? ওই বাপঠাকুরদা যেটুকু শিখিয়ে গেছিলেন, সেটুকুই ভাঙিয়ে যা চলছে। তা তোমরা এখানে কী মনে করে? ওই লাল ঝমেলা দেখতে?'

দেবু আর সুজন দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কই, দেবুর মামা তো লাল ঝামেলা নিয়ে কিছু বলেননি। আর লাল ঝামেলাটাই বা কী বস্তু?

খাওয়া শেষ করে নীচে নেমে দেবু আর সুজন একটা করে সিগারেট ধরায়, ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা স্টিলের ছোট ডিব্বা বার করে তার থেকে একটা পান বার করে মুখে দেন।

'তোমরা চেংমারি টি গার্ডেন যাচ্ছ তো? ওরই উত্তরে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা বস্তি আছে। ওটারই নাম লাল ঝামেলা বস্তি। সেখানে এই চা বাগানের মদেশিয়া কুলি কামিনদের বাস।'

'তা সেখানে কোনো ঝামেলা হয়েছে নাকি?' প্রশ্ন করে সুজন। বরাবরই তার ঠান্ডা মাথা। দেবুর মামা বলে দেননি যে চেংমারি টি গার্ডেনে ঠিক কী বাওয়াল হয়েছে। আসার আগে ওঁর সঙ্গে সুজন একবার কথা বলেছিল বটে। তাতে বরং এটাই বোঝা গেছিল যে উনিও ঠিকঠাক জানেন না ব্যাপারটা কী। ইনি কি সেই নিয়েই কিছু বলছেন?

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'যাচ্ছ তো ওখানে। গিয়েই দেখবে না হয়। আজ চলি ভাই, আলাপ করে ভারি ভালো লাগল।'

লোকটা হঠাৎ করে কথা শেষ করে দিতে দুজনেই অবাক। তবুও ভদ্রতা করে দেবু, 'আপনি তো ওদিকেই যাবেন। আপনাকে নামিয়ে দিই কোথাও?'

'আরে না-না, তার দরকার হবে না।' সহাস্যে বলে ওঠেন ভদ্রলোক, 'মালবাজারে আমার কিছু কাজ আছে। সেগুলো সেরে তবেই ফিরব। তোমরা ওখানে থাকবে তো কিছুদিন? আশা করি দেখা হয়ে যাবে।'

নমস্কার করেন ভদ্রলোক, তারপর হাঁটা লাগান। দেবু অস্ফুটে বলে, 'এই যাহ! লোকটার নামটাই জানা হল না।'

সুজন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল লোকটার যাওয়ার পথের দিকে। হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে যেতে এক টুসকিতে সেটা দূরে ফেলে দিয়ে দেবুর পিঠ চাপড়ে দেয় সে, 'চ'-চ'! এখন না বেরোলে দেরি হয়ে যাবে। লোকটা তো কাছেপিঠেই থাকে বলল। দেখা হয়েও যেতে পারে। তখনই না হয় নাম-ধাম জেনে নেব সব।'

আট মাস আগে

প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর তিনজনে যে জায়গাটায় এলেন সেটা জঙ্গলের একেবারেই নির্জন একটা অংশ। দেখলেই বোঝা যায় যে এখানে মানুষের হাঁটাচলা একেবারেই নেই। বড় হাঁসুয়া আর কাটারি দিয়ে ঝোপঝাড় আর গাছের ডালপালা কাটতে কাটতে কোনওমতে এখানে আসতে হয়েছে।

সতর্ক ছিলেন দলনেতা। এ অঞ্চলে সাপের উপদ্রব খুব। কেউটে আছে, কালাচ আছে। আছে চন্দ্রবোড়া, করাইত। আর রাজগোখরোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তো কথাই নেই।

উদ্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে দাঁড়াতেই দলনেতা লোকটি খেয়াল করলেন যে জায়গাটা শুধু নির্জন তাই নয়, অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধও বটে। মানুষ কেন, কোনও জীবজন্তুর আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল না।

আর ঠিক তখনই ব্যাপারটা অনুভব করা শুরু করলেন তিনি।

তাঁর মাথার ভেতরে এক আশ্চর্য বোধ যেন ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সমস্ত শরীর জুড়ে জেগে উঠছিল এক অব্যক্ত, অনৈচ্ছিক সতর্কতা। যেভাবে বর্ষার জল পেয়ে মাটির শরীর জুড়ে জেগে ওঠে বন্য ঘাসের দল, ঠিক সেভাবে এই বোধ সামুদ্রিক শ্যাওলার মতো চারিয়ে যাচ্ছিল তাঁর সমগ্র সত্ত্বায়। যেন এক অশরীরী অনুভূতি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দরজায় ফিসফিস করে বলছিল, 'সময় এসেছে পথিক, তৈরি হও। তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে। তৈরি হও, তৈরি হও, তৈরি হও...'

ভেতরে ভেতরে নিজের অজান্তেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন মানুষটি। এ যদি দৈবের নির্দেশ না হয় তাহলে দৈব জিনিসটা কী?

তিনি তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে নর্থ বেঙ্গলে এসে এই মিশন শেষ করার প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছিলেন। আজোবা'র ডায়েরি অনুযায়ী সময় শেষ হয়ে আসছিল দ্রুত। তার মধ্যে এই মিশন তাঁকে শেষ করতেই হত।

কিন্তু সেই একই জায়গায় যে অমন হাই প্রোফাইল, এক্সট্রিমলি হাই সিকিউরিটির একটা প্রোজেক্ট হবে, আর চাকরি ছাড়তে যাওয়ার দিনই এই প্রজেক্টের প্রজেক্ট ইন-চার্জ করে তাঁকেই পাঠানো হবে, এ কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন?

নিজের অজান্তেই তাঁর ডান হাতটা বুকের বাঁদিকে উঠে এল। বুকের ধুকপুকুনিটা হাতুড়ির মতো ঘা মারছিল তাঁর বুকে।

জায়গাটির সামনে একবার দাঁড়ালেন তিনি। তারপর যেন কার অলঙ্ঘ্য নির্দেশে, নিজের অজান্তেই তাঁর মাথাটা উত্তর দিকে ঘুরে গেল।

ওই তো, পাহাড়ের শ্রেণি দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে ডায়না নদী, ওদিকে থেকেই এলেন তাঁরা। পেছন দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণেও ডায়না নদীর বাঁক। আর ডানদিকে, মানে পূর্বদিকে...

ওই তো, ওই তো! একটা বট আর অশ্বত্থের মাঝখানে একটি পত্রহীন তালগাছ! ঠিক যেমনটি লেখা ছিল আজোবা'র ডায়েরিতে, যা দেখে নাকি চেনা যাবে সেই জায়গাটিকে!

এই তাহলে সেই অষ্টভুজক্ষেত্র?

সামনের দিকে তাকালেন তিনি। ছোট্ট একফালি জমি, একটুকরো রুমালের মতো পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। চোখের আন্দাজে মনে হল সাইজে দশ ফুট বাই বারো ফুট মতো হবে।

প্রথমেই নজরে পড়ে যে জমিটা আশ্চর্যজনক ভাবে ন্যাড়া। মানে একেবারে ন্যাড়া। গাছপালা দূরে থাক, একটা ঘাস অবধি গজায়নি। মনে হচ্ছে জঙ্গল বাড়তে বাড়তে এইখানে এসে কার আদেশে হঠাৎ করে থেমে গেছে! কে যেন সেই অলক্ষ্য লক্ষ্মণরেখায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করছে, 'তফাত যাও। এখানে কোনও সবুজের প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

যে ঘেসুড়েটি খোঁজ এনেছিল তার পায়ের কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি দেশি কুকুর। তার ভাবভঙ্গিতে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। বারবার যে তার মালিকের প্যান্ট ধরে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। বার দুয়েক ধমক খাওয়ার পর মালিকের দু-পায়ের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে রইল সে।

চোখ সরু করে জায়গাটার আকার বোঝার চেষ্টা করলেন দলনেতা মানুষটি। আজোবা যা লিখে গেছিলেন সেই লক্ষণগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি?

সন্ধানী চোখে একটু লক্ষ্য করতেই মানুষটি সেই জমিতে জন্মানো ঘাসেদের মধ্যে একটি প্যাটার্ন খুঁজে পেলেন। মনে হল কয়েকটি সরলরেখা জুড়ে গজানো ঘাসেরা যেন অন্যান্য ঘাসগুলোর থেকে আলাদা, একটু বেশি সবুজ, একটু বেশি বড়।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সেই সরলরেখাগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখতে থাকলেন তিনি।

ওরা কি কিছু বলতে চায়?

কিছু পরে একটা জ্যামিতিক ডায়াগ্রামের আকার তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। এখন তিনি তাঁর চোখের সামনে এমন তিনটি ত্রিভুজের ছবি দেখতে পাচ্ছেন যারা পরস্পরকে পাঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে

কেটেছে। তাতে ফুটে উঠেছে একটি অদ্ভুত নকশা।

একটি আটকোণবিশিষ্ট তারা।

শুধু তাই নয়। অ্যাডভান্সড ম্যাথসের ছাত্রের শিক্ষিত চোখে ধরা পড়ে গেল নকশার আসল প্যাটার্নটি।

এটা একটা অক্টাগ্রাম।

না না, শুধু অক্টাগ্রাম নয়, এটি একটি আইসোটক্সাল অক্টাগ্রাম। ঠিক যেরকমটি আঁকা ছিল আজোবা'র ডায়েরিতে।

হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল তাঁর। কোনওমতে নিজেকে সামলে পেছনে ফিরলেন, তারপর যে ঘেসুড়েটি জায়গাটার খোঁজ নিয়ে এসেছিল তাকে প্রশ্ন করলেন, 'ইস জগহ কা পতা ক্যায়সে চলা?'

'শেরু ভাগ গ্যয়া থা হুজুর,' ভীতস্বরে নিবেদন করে ঘেসুড়েটি, 'জঙ্গল মে এক নেউলা কো পিছা করতে করতে। উসি কো ঢুন্ডতে ঢুন্ডতে ইধর তক আ পঁহুছা।'

'শেরু কওন?'

'মেরা কুত্তা, হুজুর।' পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা ভীত কুকুরটিকে দেখায় সে।

'হুম।' বলে চুপ করে যান তিনি। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বলেন, 'আপলোগ চলে যাইয়ে। হাম থোড়ে দের বাদ আয়েঙ্গে।'

'লেকিন হুজুর,' আপত্তি জানায় ঘেসোদের সর্দার, 'রাস্তা পতা নেহি চলেগা তো কেইসে আইয়েগা আপ?'

'পতা চল জায়েগা, আপ সোচিয়ে মৎ। জ্যায়সে ম্যায়নে বোলা ওয়সাহি কীজিয়ে। পাঁচদিন কে অন্দর ইয়ে পুরা এরিয়া মুঝে সাফসুতরা চাহিয়ে। কাল সে এক্সট্রা দস নেহি, বিস লোগ মিল জায়েগা আপকো।'

লোকদুটো মাথা নেড়ে চলে গেলে গাঢ় নৈঃশব্দ নেমে এল জায়গাটা জুড়ে।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন মানুষটি। কেউ কোথাও নেই জেনে নিশ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র ক্ষেত্রটিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলেন তিনি।

তিনপুরুষের অপেক্ষা বোধহয় এবার শেষ হতে চলেছে। তবে হাতে সময় আর বেশি নেই। আটচল্লিশ ঘণ্টা আছে, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা। ক্যালেন্ডার তাই বলছে। তার আগেই আজোবা'র আদেশ অনুযায়ী কাজটা করে ফেলতে হবে ওঁকে। তবেই আজোবা, অর্থাৎ ঠাকুরদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবেন তিনি।

পাঁচ মিনিট বাদে ফেরার রাস্তা ধরলেন সেই মানুষটি যাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনের সর্বেসর্বা করে পাঠানো হয়েছে। তিনি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকাল উইংস-এর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, মেজর রাহুল অশোকরাও মাত্রে।

খানিকক্ষণ বাদে একটু দূরের টিলা থেকে আরেকটা ছায়া সরে গেল। অভিরাম বেসরা'র মনে কু-ডাক ডাকছিল খুবই। এই লোকটার হাবভাব ভালো ঠেকছে না তার।

*

ঝামেলাটা যত ছোট মনে হয়েছিল তত ছোট নয়। দেবু'র মামা বৃথাই ভেবেছিলেন যে ওরা সামাল দিতে পারবে। বোধহয় তিনিও ব্যাপারটার গুরুত্ব ততটা বোঝেননি। অথবা তাঁকে সঠিক খবর দেওয়া হয়নি।

গত কয়েকদিন ধরেই চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারীরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই শ্রমিকদের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা তেমন বড় কিছু না। এককালে অবাধ্য শ্রমিকদের গুম করার অনেক উপায়ই জানতেন মালিকপক্ষের লোকজন। এখন সেসবের চল নেই বটে, কিন্তু তাতেও বিপদ কমেনি খুব একটা।

চা বাগানের মাঝে বৃষ্টির জল বয়ে যাওয়ার জন্য গভীর নালা কাটা থাকে, সেখানে মাঝে-মাঝেই আশ্রয় নেয় গর্ভিণী পাহাড়ি চিতা। তাদের হাতেও কম লোক মরে না। এছাড়া আশপাশের গাঁয়ের ছোকরা বা ছুকরির সঙ্গে ছুটকো আশনাই মহব্বত জমে উঠলে জোড়ে পালিয়ে যাওয়া তো আছেই। সেগুলো চেংমারি বা আশেপাশের চা বাগানের শ্রমিকদের গা-সওয়া।

কিন্তু এবার ব্যাপারটা আলাদা।

প্রথম ঘটনাটা ঘটে হপ্তাখানেক আগে। বুধন মাহাতোর বউ সেরালি গেছিল কেরোসিন আনতে। তখন একটু রাত হয়েছে। এসব কেনাকাটি সচরাচর বুধনেরই করার কথা। কিন্তু সেদিন সন্ধেতে মাদারিহাট থেকে তার শালা বাবুলাল এসেছিল দিদির সঙ্গে দেখা করতে। একটা দেশী বনমুরগি আর দ্রৌপদী সরেনের ভাঁটির দুইখাম্বা সরেস ধেনো। বুধনের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে কেরোসিনের ডিব্বা হাতে সেরালি নিজেই হাঁটা দেয় বস্তির বাইরে মুদীর দোকানের দিকে।

ঘণ্টাখানেক পরেও সেরালি না ফেরায় শালা-জামাইবাবুর টনক নড়ে। মেয়েটা গেল কোথায়? প্রথমের বুধনের সন্দেহ হয় শালী পাশের বস্তির যোগেনের সঙ্গে পালিয়ে যায়নি তো? কিন্তু যদি পালাবারই হয় তবে সোনাদানা টাকাপয়সা আছে সেসব নিয়ে রাতে পালাতে পারত। কেরোসিনের ডিব্বা হাতে কেউ পালিয়েছে বলে আজ অবধি এ বস্তিতে কোনো খবর নেই।

দুদিন ধরে গরু-খোঁজা করা হয়। সেই সার্চ পার্টিতে যোগেন নিজেও ছিল। মায়ের নামে কিরে কেটে যোগেন বলে সেরালিকে সে নিজের বোনের মতো দেখত, অন্যকিছুর কথা ভাবতেই পারে না। তন্নতন্ন করে দু'দিন খোঁজার পর সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, থানার বড়বাবু অবধি গা করছেন না, তখন হারিয়ে গেল বস্তির সবচেয়ে পুরোনো লোক ঘনরাম মান্ডি।

ঘনরাম নিখোঁজ হওয়াতে বেশ শোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাপে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হল পুলিশ।

স্থানীয় লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। উঠতি নেতা অভিরাম বেসরা এই মওকাটাই খুঁজছিল। বড়বাবুর থাপ্পড়ের এত বড় জবাব দেওয়ার সুযোগ পাবে সে? একদিন থানা ঘেরাও হল। অভিরাম চোঙা হাতে নতুন বড়বাবুর অপদার্থতার ব্যাপারে একখানি বেশ চোখা চোখা বাক্যবাণ সমৃদ্ধ জ্বালাময়ী ভাষণ পেশ করল।

অভিরাম এই এলাকার জনপ্রিয় লোক, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কনট্যাক্ট পয়েন্টও বটে। শাসক দলের হয়ে লাল ঝামেলা বস্তির ভোট সেই ম্যানেজ করে দেয়।

খবর পৌঁছল শিলিগুড়ি অবধি।

কিন্তু প্রশাসন নড়েচড়ে বসার আগেই ঘটে গেল আরেকটা অঘটন। ঘনরাম হারিয়ে যাওয়ার ঠিক পাঁচদিনের মাথায় হারিয়ে গেল অভিরাম বেসরা নিজে!

*

ডায়না নদীর অন্য পারে ছোট একটা কটেজ, নাম 'সোনার বাংলা'। এমনিতে ট্যুরিস্টদের ভিড়ে কটেজটা সদাসর্বদাই জমজমাট হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গ তো বটেই, সীজন টাইমে সুদূর কলকাতা থেকেও শৌখিন পর্যটকের দল ভিড় জমান এখানে।

কিন্তু গত মাস তিনেক ধরে পুরো কটেজটা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বুক করে রাখা হয়েছে। সেখানে শুধু সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের আনাগোনা। শুধু তাই নয়, পুরো কটেজ জুড়ে উচ্চপর্যায়ের সিকিউরিটি মজুত চব্বিশ ঘণ্টাই। তাদের যেমন পাথরকোঁদা চাউনি, তেমন নির্মম ব্যবহার। এরিয়ার মধ্যে কোনও চ্যাংব্যাং দেখলেই মার ছাড়া কথা নেই।

'বলি এখানে হচ্ছেটা কী দাদা? দু'দুটো লোক হারিয়ে গেল। সে নিয়ে পুলিশের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। কাল শিলিগুড়িতে পার্টি অফিসে ফোন করেছিলাম। পালবাবুও চুপ করে বসে থাকতে বলছেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কটেজের মালিক দেবাশিস বারিকের সঙ্গে বসে আড্ডা জমাবার চেষ্টায় ছিল অভিরাম। যে কয়েকজন এই কটেজের মালিকের সঙ্গে সরাসরি আড্ডা জমাতে পারে, অভিরাম তাদের মধ্যে একজন।

'জানি না ভায়া।' ব্যালেন্টাইনের ছয় নম্বর নিট পেগটা গলায় চালান করে দিয়ে বললেন দেবশিসদা, 'তবে কয়েকদিন ধরে অফিসাররা খুব চিন্তিত। ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে খুব। দিল্লি থেকে গভর্নমেন্টের উঁচু লেভেলের লোকজন আসছে। আর্মির বড় বড় অফিসারেরাও আসছে। ছোটখাটো কিছু নয় হে, বেশ বড় আকারের কিছু একটা ঝামেলা বেঁধেছে। সে তোমার আমার বোঝাবুঝির বাইরে।'

'তোমার সঙ্গে ওদের কোনও আলোচনা হয় না এই নিয়ে?' পরের পেগটা বানাতে বানাতে সতর্কভাবে জিগ্যেস করল অভিরাম।

'আর আলোচনা', চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করলেন দেবাশিসদা, 'সামান্য হাই হ্যালো'র বাইরে কথাই বলে না তো আলোচনা, হুঁ।'

'আচ্ছা একটা কথা বলো তো দাদা,' একটু কাছ ঘেঁষে এল অভিরাম, 'তোমার মনে হয় না, ওই যন্তরমন্তরের সঙ্গে এইসব লোক হারিয়ে যাওয়ার কোনও কানেকশন থাকতে পারে?'

'জানি না ভায়া,' নেশাগ্রস্তভাবে কথাগুলো বললেন দেবাশিসদা। মনে হচ্ছিল বহুদিন বাদে পরের পয়সায় দামি স্কচ খেয়ে সামান্য বেএখতিয়ার হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। সপ্তম পেগে চুমুক দিয়ে বললেন, 'শুধু এটুকু জানি যে এখানে নাকি কীসব সায়েন্সের পরীক্ষা-টরিক্ষা হচ্ছিল। সে নাকি হেবি সিক্রেট জিনিস। এত সিকিউরিটির তামঝাম সেই জন্যই। সেই যে যন্তরমন্তর থেকে লোকজন হাপিস হয়ে গেল, তারপর থেকেই তো বাবুদের এত ছটফটানি। এখন কে কোথায় সায়েন্সের কী গ্যাঁড়াকল করে রেখেছে সে আমি কী করে বলি বলো তো?'

'তা এত খবর তুমি জানলে কী করে? এইমাত্র যে বললে তোমার সঙ্গে নাকি হাই হ্যালো ছাড়া কথাই বলে না?'

'সে তো বলেই না। তবে যে লোকটাকে এরা কুক হিসেবে রেখেছে, সেইই একদিন মাল খেয়ে বলে ফেলেছিল আমাকে... খি খি খি... মাতালদের কাজকারবার তো জানোই...' বলতে বলতেই অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

মাতাল লোকটাকে ফেলে চলে আসছিল অভিরাম। কটেজের ভেতরের রাস্তা ওর চেনা। ঢোকার সময়েই ওর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশেষ ডিজিটালি অ্যাক্টিভেটেড কার্ড, যেটা ওর চোখের মণির ছবির সঙ্গে লিঙ্ক করা আছে। এই কটেজের যে-কোনও সিকিউরিটি যে কোনও সময়ে সেটা দেখতে চাইতে পারে, এবং তার চোখে বিশেষ টর্চের আলো ফেলে সেটা আসল না নকল তা যাচাই করতে পারে। মিললে ভালো, না মিললে...

না মিললে যে কী সেটা অভিরাম নিজেও জানে না। তবে সেটা খুব যে সুখকর হবে না অন্তত সেটুকু ও খুব ভালো করেই বোঝে।

দেবাশিসদা'র ঘর থেকে কটেজের গেটটা একটু দূরে। মাঝখানে একটা ছোট ফোয়ারা মতো আছে। রাস্তাটা তার পাশ দিয়ে ঘুরে যায়। এখন অবশ্য ফোয়ারাটা বন্ধ।

শুনশান রাস্তা। কটেজের বাগান থেকে জুঁইফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। আকাশে আধখানা চাঁদ উঠেছে, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া।

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিন্তাগ্রস্তভাবে হাঁটছিল অভিরাম। অনেক চিন্তাভাবনা করেও কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিল না সে।

কিসের সায়েন্সের পরীক্ষা হচ্ছিল যন্তরমন্তরে? তার এত গোপনীয়তা কীসের? কেন তাকে পালবাবু চুপ করে থাকতে বলছে? লোকগুলো হারিয়ে যাওয়ার পরেও কোনও পুলিশ কেস হচ্ছে না কেন? যন্তরমন্তরে এত সিকিউরিটি কীসের জন্য? সেদিন ওই লিডার গোছের লোকটা জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে কী করছিল?

ফোয়ারার কাছাকাছি আসতেই একটা ভুক ভুক আওয়াজ শুনে থমকে গেল অভিরাম। সিকিউরিটির ওই বাঘাটে কুকুরগুলো নাকি? রটওয়েলার না কি যেন নাম, এক একটা কুকুর দিনে কিলোখানেক করে পাঁঠার

মাংস খায়। কী ভয়ঙ্কর চাউনি ব্যাটাদের, দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়!

এদিক ওদিক দেখে অভিরাম বুঝল আশেপাশে কেউ নেই। তাহলে তো আরও মুশকিল। কুকুরটা ছাড়া আছে নাকি? তাহলে তো আরও চিত্তির! ঘাড়ের ওপর একবার এসে পড়লে আর দেখতে হবে না! এক কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে নিতে পারে শালারা!

ফের সেই ভুকভুক আওয়াজ। কানটা খাড়া করল অভিরাম। আওয়াজটা ফোয়ারার ভেতর থেকে আসছে না?

একটু একটু করে এগিয়ে ফোয়ারার ভেতর উঁকি দিল অভিরাম।

প্রথমে কিছু নজরে পড়ল না ওর। কোনও কুকুর কেন, কোনও প্রাণীই নেই ওখানে। ফোয়ারার ঘন কালো জল জমে আছে নীচটায়। আর কিচ্ছু নেই।

আওয়াজটা তাহলে কে করল?

খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর অভিরামের মনে হল ফোয়ারার জলে যেন একটা সূক্ষ্ম কম্পন শুরু হয়েছে। তিরতির করে কাঁপছে জলের উপরিভাগ।

জলটা কাঁপছে কেন? ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল অভিরাম।

কম্পন বাড়তে থাকল ক্রমশ। এবার তার সঙ্গে জলের মধ্যে ছোট ঘূর্ণি তৈরি হতে লাগল। প্রথমে ধীরে, তারপর বেগ বাড়তে লাগল ঘূর্ণিগুলোর। ক্রমে বড় হতে হতে একে অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ওরা।

নড়তে পারছিল না অভিরাম। কে যেন তার পা দুটোকে গেঁথে দিয়েছিল সেখানে।

হঠাৎ করেই যেন ঘূর্ণিগুলোর বেগ ধীর হয়ে আসতে থাকল। যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ করে থেমে যেতে লাগল জলের ঘূর্ণনস্রোত।

আবার শান্ত হয়ে এল জলের উপরিভাগ।

এবার ধীরে ধীরে জলের মধ্যে কার যেন একটা অবয়ব ফুটে উঠতে লাগল।

মোহগ্রস্তের মতো সেদিকে তাকিয়েছিল অভিরাম। কার মুখ ও? সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে জলের অতলে? ও কার ছায়া?

একবার আকাশের দিকে তাকাল অভিরাম। নিশ্চিন্ত নির্মল আকাশ। কোথাও কোনও বাধাবন্ধ নেই। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কোথাও কোনও আলো নেই। কোথাও কোনও প্রাণ নেই।

মাথা নীচু করল অভিরাম। ঠিক তার সামনে সিংহের মতো কেশরওয়ালা একটি মস্ত বড় কুকুর দাঁড়িয়ে!

আর্তচিৎকার করার অবকাশও পেল অভিরাম। দুই থাবায় তাকে টেনে ধরে অতল জলের নীচে ঝাঁপ দিল সেই কালভৈরব।

*

কথা হচ্ছিল ডায়না নদীর পাড়ে একটা বড় পাথরের ওপর বসে। দেবু, সুজন আর সেই মালবাজার ট্যুরিস্ট লজে আলাপ হওয়া বাংলার টিচার। এতক্ষণে অবশ্য ভদ্রলোকের নাম জেনে গেছে ওরা।

'আমাকে কৃষ্ণদা বলেই ডেকো ভাই,' হাসতে হাসতে বলেছিলেন ভদ্রলোক, 'এরাও তাইই বলে। আসল নাম একটা আছে বটে, তবে সেটা আমি নিজেও খুব একটা মনে রাখি না। ছোটবেলা থেকেই কেষ্ট, কেষ্টা শুনতে শুনতে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে চট করে সেই নামে কেউ ডাকলে প্রথমে বুঝতেই পারি না আমাকে ডাকছে বলে।'

ওরা কেন এসেছে এখানে, সে-কথাটাও ভদ্রলোককে জানিয়েছে দু'জনে। যা অবস্থা তাতে একজন স্থানীয় মানুষকে পাশে রাখা ভালো।

আজ সকালেই দু'জনে বেরিয়েছিল ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখবে বলে। টি-গার্ডেন এখন প্রায় ফাঁকা, কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধ। শুধু কয়েকজন সিকিওরিটি গার্ড, আউট হাউসের কেয়ারটেকার আর বাজবাহাদুর ওরফে বাজু, এই ক'জনই রয়ে গেছে। শ্রমিকরা ডিউটিতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে বেশ কয়েকদিন হল। এই নিয়ে একটা চাপা থমথমে আবহাওয়া ছেয়ে আছে চারিপাশে।

খবরটা মোবাইলে মামাকে জানাতে দেরি করেনি দেবু। কিন্তু ট্যাক্স সংক্রান্ত একটা বড় ঝামেলা পেকে উঠেছে কলকাতায়। সেসব না সামলালে যা পেনাল্টি ধার্য হতে পারে তাতে চা বাগানটা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেবুর মামা বলেছেন উনি দিন চার-পাঁচের আগে কলকাতা ছেড়ে নড়তে পারবেন না।

তবে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে ওপর মহল থেকে কলকাঠি নেড়ে স্থানীয় থানাকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে। ওরা যেন যে করে হোক কয়েকটা দিন সামলে নেয়, বেশি ঝামেলায় না জড়ায়। বাকিটা তিনি এসে সামলে নেবেন।

ওরা থানাতেও গেছিল। বড়বাবু পাত্তাই দিলেন না। 'দুঃখিত, এইসব সেনসিটিভ ইনফর্মেশন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারব না'---এই ছিল তাঁর উত্তর।

থানা থেকে তাড়াটাড়া খেয়ে দুজনে ডায়না নদীর দিকে আসছিল। নদীর ধারে দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনিই ব্যাপারটা ওদের কাছে খোলসা করলেন।

'তারপর থেকেই লোকজন একেবারে ঘাবড়ে গেছে, বুঝলে।' হাতে ধরা ছোট লাঠিটা দিয়ে মাটিতে আঁক কাটতে কাটতে চিন্তিত স্বরে বলছিলেন ভদ্রলোক, 'পুলিশ যে কিছু করতে পারছে না তাই নয়। ইনফ্যাক্ট, তাদের কিছু করতেই দেওয়া হচ্ছে না এ বিষয়ে।'

কথাটা শুনে দু'জনেরই ভারি আশ্চর্য লাগে।

'সে কী! পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, মানে? তিন-তিন জন লোক হাপিশ হয়ে গেল, আর পুলিশকে কাজ করতে দিচ্ছে না? কে কাজ করতে দিচ্ছে না? আর কেনই বা দিচ্ছে না?' প্রশ্নটা সুজনই করে।

প্রশ্নটা শুনে গম্ভীর হয়ে যান কৃষ্ণদা। তারপর নীচু গলায় বলেন, 'এর পেছনে একটা মস্ত বড় রহস্য আছে হে। নদীর ওপারে ওই সাদা রঙের বিল্ডিংটা দেখেছ?'

দেখেছে দু'জনেই। এই নির্জন অঞ্চলে এমন একটা পাকা বাড়ি দেখে ওরা অবাকই হয়েছিল। ওদিকে ভুটানের পাহাড়, সামনে তিরতিরে পাহাড়ি নদী আর পিছনে নীল আকাশ, তার মধ্যে গম্ভীরভাবে জেগে আছে সাদা রঙের দোতলা বাড়িটি। তার পেছনে আবার মস্ত বড় একটা ফ্যাক্টরি, একই চৌহদ্দির মধ্যে।

ওরা একবার ভেবেছিল, গিয়ে দেখে আসবে ওটা কার বাড়ি, আর এমন অদ্ভুত জায়গায় অতটা জায়গা নিয়ে এমন পাকা বাড়ি বানাবার মানেটাই বা কী? তবে সেসব দেখতে গেলে বিস্তর রাস্তা ঠ্যাঙাতে হবে। তারপর একটা কাঠের পুল পেরিয়ে তবেই ওপারে যাওয়া যায়। অতটা গিয়ে লাভ হবে কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। তাই আপাতত সেই ইচ্ছায় ইতি দিয়েছে দু'জনে।

'গেলেই যে ওখানে ঢুকতে পেতে তার কোনো মানে নেই।' ওদের প্ল্যানের কথা শুনে স্মিতহাস্যে বলেন ভদ্রলোক, 'পণ্ডশ্রম হত।'

'কেন বলুন তো?' দেবুর বিস্মিত প্রশ্ন।

'কারণ বাড়ির সামনে মিলিটারির কড়া পাহাড়া। তোমাদের কাউকে চৌহদ্দির মধ্যে আসতেই দিত না।'

'মিলিটারি? এখানে?' ভারি অবাক হয় দু'জনে, 'কেন?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন ভদ্রলোক। তারপর বলেন, 'কারণ যে ঝড়ের রাতে যন্তরমন্তর অন্ধকার হয়ে গেছিল, ঠিক সেই রাত থেকেই লোকজনের নিখোঁজ হওয়া শুরু।'

আট মাস আগে

গভীর রাত। জঙ্গলের মধ্যে এক বিশেষ জায়গায় দশ বাই বারো সাইজের জমির চার কোণে চারটে হ্যাজাক জ্বলছে।

হ্যাজাক বলা ভুল। এ এক বিশেষ মিলিটারি গ্রেড ল্যাম্প, নাম কন্ট্রোলুমিনো। এই প্রোগ্রামেবল ল্যাম্পে প্রোগ্রাম সেট করে দিলে এক নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই আলো ছড়ায়। তার বাইরে এই আলো প্রায় অদৃশ্য।

মেজর রাহুল মাত্রে হাঁটু গেড়ে বসে পুরো জায়গাটাকে একবার জরিপ করে নিলেন। মনে মনে ছকে নিলেন পরের কর্মপদ্ধতি। পুরোটা শেষ করতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি লাগার কথা নয়।

পিঠের রুকস্যাকটা থেকে বেশ কয়েকটা আধুনিক যন্ত্রপাতি বার করলেন রাহুল। তার একটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড সারফেস সোনার। মাটির নীচে দশ ফুটের মধ্যে কী কী লুকোনো আছে তার একটা মোটামুটি আইডিয়া দিতে পারে এই যন্ত্র। শুধু তাই নয়, সেসবের মোটামুটি থ্রি ডাইমেনশনাল ছবিও এঁকে দিতে পারে। বাকি যন্ত্রপাতিগুলো সবই ব্যাটারিচালিত অত্যাধুনিক খননযন্ত্র।

আর রয়েছে একটা পুরোনো ডায়েরি।

ডায়েরিটার গায়ে পরম মমতায় একবার হাত বুলিয়ে নিলেন রাহুল। এক নিরপরাধ সন্ন্যাসীর নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা মিশে আছে এই ডায়েরির পাতায় পাতায়। মিশে আছে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর প্রতি এক মরণোন্মুখ বন্ধুর সুতীব্র ঘৃণার আখ্যান। মিশে আছে এক খুনে গুপ্তচরের অন্তর্বেদনা, অনুশোচনার তীব্র দহনজ্বালা।

আর মিশে আছে একটি হাজার বছরের পুরোনো কাহিনি। বড় অদ্ভুত, বড় অবিশ্বাস্য, বড় আশ্চর্য সেই গল্প।

এই ডায়েরিটা লেখার পরপরই পাগল হয়ে গেছিলেন আজোবা। সারাদিন চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকতেন। মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী দেখলেই ঠকঠক করে কাঁপতে থাকতেন প্রবল আতঙ্কে।

ডায়েরিটা পরম মমতায় নিজের বুকে তুলে নিলেন রাহুল। আজোবা যা করেছিলেন তার ক্ষমা নেই। গুপ্তচর দুনিয়াতে ডাবল ক্রসিং ঘৃণ্যতম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর সেই ডাবল এজেন্ট যখন নিজের নিরপরাধ বিশ্বস্ত বন্ধুকে মর্মান্তিক নরকযন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেয়, তখন?

স্বয়ং ঈশ্বরও সেই অপরাধ ক্ষমা করেন না।

তবুও, রতনলাল মাত্রে তাঁর ঠাকুরদা। পূর্বপুরুষের রক্তের ঋণ শোধ করার কিছু দায়িত্ব তো বর্তায় রাহুলের কাঁধে, বর্তায় না?

চটপট অ্যালুমিনিয়ামের ডান্ডার কয়েকটা টুকরো পরপর ফিট করে চারটে ফুট ছয়েকের ডান্ডা বানালেন রাহুল। জমিটার চারদিকে লাগিয়ে দিলেন সেগুলোকে। সারফেস সোনারের অপারেটিং মডিউলটা হাতে নিয়ে বসে কন্ট্রোল প্যানেলটা অন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ডান্ডার মাথায় ফুটে উঠল একটি রক্তাভ লাল আলোর বিন্দু। আর প্রতিটি বিন্দু থেকে অন্য তিনটি ডান্ডার মাথা এবং পায়ের কাছে ছিটকে গেল দুটি করে উজ্জ্বল লেজার রশ্মির শিখা।

ধীরে ধীরে কন্ট্রোল প্যানেলের ভিজ্যুয়ালস অন করলেন রাহুল। মিনিট পাঁচেক চেয়ে থেকে সেটাকে নামিয়ে রাখলেন নীচে। তাঁর কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আইসোটক্সাল অক্টাগ্রামের ছবিটা এখন স্পষ্ট। সেই ছবি বলছে যে মাটির প্রায় তিন ফুট নীচে, এই অক্টাগ্রামের প্রতিটি শীর্ষবিন্দুতে গাঁথা আছে একটি করে অবজেক্ট বা বস্তু। খুব সম্ভবত লাইফ ফিগার, উচ্চতা পাঁচ থেকে ছ'ইঞ্চির বেশি নয়। আর এই অক্টাগ্রামের ঠিক মাঝখানে রয়েছে আরেকটি লাইফ ফিগার, আগের আটটির থেকে সামান্য বড়।

ঠিক যেমন লেখা ছিল আজোবার ডায়েরিতে।

কাজের সময় মদ্যপান করা ঘোরতর অপছন্দ রাহুল মাত্রের। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকছিল না তাঁর। রুকস্যাকে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় হুইস্কির বোতল বার করে আনলেন তিনি। গলায় ঢেলে নিলেন খানিকটা সোনালি আগুন।

তারপর কয়েকটা ব্যাটারি অপারেটেড মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়লেন পরের পর্যায়ের কাজে।

*

'মাসদুয়েক আগে হঠাৎ করেই গড়ে তোলা হয় এই দোতলা বাড়িটা। প্রথমে শোনা গেছিল, প্রবাসী কোনো বাঙালি বিজ্ঞানী বানাচ্ছেন। পরে আবার শোনা গেল, ওটা নাকি আসলে সরকারেরই একটা প্রোজেক্ট!

পুরো চৌহদ্দির মধ্যে একদিকে আছে ওই দোতলা বাড়িটা। অন্যদিকে ওই কারখানার মতো বিশাল ঘরটা। ওই কারখানার মধ্যে মধ্যে বিরাট বড় একটা মেশিন আছে। ওর নামেই স্থানীয় লোকেরা বাড়িটার নাম দিয়েছে যন্তরমন্তর।

বাড়ির ভেতরটা পুরোটাই এসি করা। পেছনদিকে জেনারেটর আছে, যন্তরমন্তরে কক্ষনো কারেন্ট যায় না।

বাড়িটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেখানে থাকতে আসেন এক প্রৌঢ় প্রফেসর। তাঁর নাম কেউ জানে না। সবাই ডাকে স্যার বলে। সবাই বলতে অবশ্য বাড়ির জনা চারেক গাঁট্টাগোট্টা কাজের লোক, আর দুজন অবাঙালি দারোয়ান। এরা সবাই বাইরের লোক। না তারা বাড়ির বাইরে আসে, না কারও সঙ্গে কথা বলে।'

এতটা বলে দেবুর দিকে ফেরেন কৃষ্ণদা, 'তোমার মামা কখনও এটার কথা বলেননি তোমাদের?'

দেবু খানিকটা মাথা চুলকে নেয় প্রথমে। তারপর বলে, 'আসলে মামার সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে সেভাবে আলোচনা তো হয়নি। এখানে আসাটাও ঝট করেই। তাই...'

'হুঁ।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন কৃষ্ণদা, তারপর ফের বলতে শুরু করেন।

'যন্তরমন্তর নিয়ে লোকজনের কৌতূহলের আরও একটা বিষয় হল কড়া সিকিওরিটি। চারিদিকে বারোফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপর বসানো কাঁটাতারের মধ্যে দিয়ে সবসময় চারশো চল্লিশ ভোল্টের ইলেক্ট্রিসিটি চলে। বাড়ির সর্বত্র ক্যামেরা বসানো। বাইরে থেকে আসা সব্বাইকে একটা ছোটো যন্ত্রে দশ আঙুলের ছাপ দিয়ে তবেই ভেতরে যেতে দেওয়া হত।

ফলে যন্তরমন্তর নিয়ে একটা ধোঁয়াশা রয়েই গেছে। কেউ বলে ওখানে জাল নোট ছাপা হয়। কেউ বলে ওটা স্মাগলিঙের ডেন। অনেকের মতে ওটা গোপন অস্ত্র কারখানা। মোটমাট যন্তরমন্তর নিয়ে লোকজনের কৌতূহলের শেষ নেই। এরই মধ্যে একদিন ঘটে যায় একটা দুর্ঘটনা।'

'ঝড়জলের রাতের ব্যাপারে কী একটা বলছিলেন না?' প্রশ্ন করে সুজন।

'বলছি।' বলে ওদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসেন ভদ্রলোক, 'ওখান থেকেই তো কাহিনির শুরু।'

'গল্পটা আমাকে বলেছিল ঘনরাম। সে ছিল ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। আমিই তাকে বারণ করি এ কথা পাঁচকান করতে।

সেই রাতে প্রবল ঝড়জল হচ্ছিল। বস্তির কেউই বাইরে ছিল না, শুধু ঝন্টু মণ্ডলের ঠেক থেকে ফুল দুটো পাঁইট শেষ করে ফিরছিল ঘনরাম। যতই ঝড়জল হোক, ঝন্টু'র ঠেকে যেতে ভুল হয় না বুড়োর।

ফেরত আসার পর বোধহয় একটু জিরোতেই একটা ঝোপড়ার ভেতরে বসে হাঁপিয়ে নিচ্ছিল বুড়ো। তখনই নদীর ওপারে তার নজর গেলে ঘনরাম একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়।

হঠাৎ করে তার মনে হয়, যেন কোনো একটা দৈত্য বাড়িটাকে সজোরে চেপে ধরেছে। বাড়ির আলোগুলো ভয়ানকভাবে কাঁপছিল সেই রাতে। অন্ধকারের মধ্যেই ঘনরামের মনে হয়, বাড়িটা যেন অতি কষ্টে একবার নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে। তখনই ও শোনে, ফ্যাক্টরির মতো ঘরটা থেকে একটা চাপা শোঁ-

শোঁ আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। দোতলার ঘরের কাচের জানলার ওপাশে সে বেশ কিছু লোককে দৌড়োদৌড়ি করতেও দেখে।

হঠাৎ ঘনরামের নজরে পড়ে যে যন্তরমন্তরের আকাশ ঘিরে একটা অদ্ভুত নীল আলোর বলয়। সেটা নেমে আসার চেষ্টা করছে বাড়িটার ওপর! সেই সঙ্গে আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই শোঁ-শোঁ শব্দ। ঘনরামের মনে হয়, ধীর কিন্তু নিশ্চিত ভঙ্গিতে সেই অতি বিশাল কালো বৃত্তটি গিলে খেতে চাইছে বাড়িটাকে।

এরপর একনাগাড়ে প্রায় কুড়িটা বাজ পড়ে ওই জায়গায়। ঘনরাম এমনিতে বাজে খুব ভয় পায়, কিন্তু সেদিন কে যেন তার চোখ দুটো আটকে রেখেছিল বাড়িটার দিকে। শেষবার বজ্রপাতের সঙ্গে-সঙ্গে একটা হাহাকার তুলে সেই নীল বলয়টি যেন অন্ধকারের গুঁড়োর মতো মিশে যেতে থাকে দুপাশের জমাট অন্ধকারের মধ্যে।

সবকিছু থেমে গেলে ঘনরাম কাঁপতে কাঁপতে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। এসব কথা আমাকে ছাড়া কাউকে বলেনি সে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ও শোনে, যন্তরমন্তর থেকে যেন ভোজবাজির মতোই উধাও হয়ে গেছে বাড়ির লোকগুলো। সেদিন থেকেই যরন্তরমন্তরের দখল নেয় মিলিটারি। আর শুরু হয় লাল ঝামেলা বস্তি থেকে একের পর এক হারিয়ে যাওয়া।'

আট মাস আগে

রাহুল মাত্রের বাঁ-হাতের কব্জিতে বাঁধা মাল্টিফাংশনাল মিলিটারি রিস্ট ওয়াচের ডায়ালে তখন রাত দুটো।

তাঁর সামনে এখন আইসোটক্সাল অক্টাগ্রামটির আট কোণে আটটি গর্ত। প্রতিটি গর্তের সামনে আটটি ছোট ছোট মূর্তি রাখা। একটু আগেই তাদের তুলে আনা হয়েছে মাটির গর্ভ থেকে। প্রতিটি মূর্তির গায়ে মাটি কাদা লেগে।

মন দিয়ে মূর্তিগুলি দেখছিলেন রাহুল। ডায়েরির কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এই মূর্তিগুলির বয়েস হাজার বছরের কাছাকাছি। এগুলির পূজা করতেন এক অসামান্য শক্তিধর সাধক।

ধীরে ধীরে প্রতিটা মূর্তির নাম ডায়েরি থেকে পড়তে লাগলেন রাহুল। পূর্ব কোণের মূর্তিটি যাঁর, তাঁর নাম বজ্রাঙ্কুশী। পশ্চিমদিকের দেবীটির নাম বজ্রস্ফোটা। উত্তরে আছেন বজ্রঘন্টা, দক্ষিণে বজ্রপাশী।

অপ্রধান কোণগুলিতে অবশ্য দেবীদের না, দেবতাদের অধিষ্ঠান। নৈঋতকোণে আছেন নীলদণ্ড, বায়ুকোণে মহাবল। অগ্নিকোণের দেবতাটির নাম টক্কিরাজ, ঈশান কোণে অধিষ্ঠিত আছেন ত্রৈলোক্যবিজয়।

লোবসাং বলে গেছিলেন আট কোণে এই আটজন মহাবলশালী দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল অষ্টভুজক্ষেত্রটির বীজকায়া।

আর ক্ষেত্রের মধ্যিখানে হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে আছেন যিনি?

তাঁকে তুলে আনতে গেলে প্রবেশ করতে হবে এই অষ্টভুজক্ষেত্রের মধ্যে। কিন্তু রাহুল জানেন যে, প্রাথমিক প্রক্রিয়া সমাপ্ত না করে এই অষ্টভুজক্ষেত্রে পা দেওয়া নিষেধ, প্রবলভাবে নিষেধ।

প্রথমে প্রতিটি দেবীমূর্তির জায়গায় দেবতাদের মূর্তিগুলি এনে রাখতে শুরু করলেন রাহুল, ঘড়ির কাঁটার উল্টো চলন ধরে বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ভাবে। উত্তরদিক থেকে বজ্রঘণ্টাকে তুলে এনে রাখলেন উত্তর পূর্বে, বায়ুকোণে। বায়ুকোণ থেকে মহাবলের মূর্তি এনে রাখলেন পশ্চিমে, বজ্রস্ফোটার জায়গায়। শেষ অবধি ত্রৈলোক্য বিজয়ের মূর্তি উত্তরদিকে এনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রিয়াটির প্রথম ধাপ শেষ হল।

উঠে দাঁড়ালেন রাহুল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল মাটিতে যেন অতি সামান্য একটা মৃদু কম্পন শুরু হয়েই থেমে গেল।

এরপর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।

এক এক করে প্রতিটি মূর্তি তুলে এনে ঠিক তার উল্টোদিকে রাখতে শুরু করলেন রাহুল। উত্তরদিক থেকে ত্রৈলোক্য বিজয়ের মূর্তি তুলে এনে রাখলেন দক্ষিণে। দক্ষিণের নীলদণ্ডের মূর্তি গেল উত্তরে। অগ্নিকোণের বজ্রপাশী গেলেন বায়ুকোণে, নৈঋতকোণের বজ্রস্ফোটা গেলেন ঈশানে।

পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে করতে একটা কথাই মাথায় এল রাহুলের। তিনি যেটা করছেন সেটা আর কিছুই না, একটা প্যাটার্ন আনলক করা। পুরোটাই যেন একটা জটিল ধাঁধা সলভ করার পাসওয়ার্ড।

এইবার প্রতিটি মূর্তি মাটিতে খুঁড়ে রাখা গর্তের মধ্যে সযত্নে নামিয়ে দিলেন। তারপর মাটিচাপা দিলেন মূর্তিগুলিকে।

শেষ মূর্তিটিকে প্রোথিত করে ওঠার সময়েই রাহুল টের পেলেন যে সমগ্র অষ্টভুজক্ষেত্রটি জুড়ে একটা মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ক্ষেত্রটির বাইরের ভূমিতে কিন্তু কিছু টের পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপর যেটা ঘটল সেটা আরও আশ্চর্যের, প্রায় ম্যাজিক!

রাহুলের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে মাটির বুক চিরে, অক্টাগ্রামের প্রতিটি শীর্ষবিন্দুতে জেগে উঠল একটি করে নীল আলোর পিণ্ড। প্রতিটি পিণ্ড থেকে নির্গত হল একটি করে ঋজু আলোকরেখা। তারা এসে মিলিত হল অক্টাগ্রামটির ঠিক মধ্যবিন্দুতে।

মেজর রাহুল মাত্রে দেশের একজন প্রথম সারির কম্যান্ডো। মাথা ঠান্ডা বলে সুনাম আছে তাঁর। বহু কভার্ট অপারেশনে অংশ নিয়েছেন, বার তিনেক ফিরে এসেছেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে। তবুও তাঁর হাত-পা কাঁপছিল এই অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখে!

মনের জোরে নিজেকে শক্ত করলেন তিনি। এখন দুর্বল হওয়ার সময় নয়, রক্তের ঋণ শোধ করার সময়।

এইবার শেষ ধাপ। মাটি খোঁড়ার পোর্টেবল আর্থ মুভার আর অটোমেটেড ক্লাচারটা নিয়ে ভেতরে পা রাখলেন তিনি। মনে হল পুরো ভূমিখণ্ডটি যেন গোঙাচ্ছে, পায়ের নীচে তার স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

অক্টাগ্রামের মধ্যবিন্দু বরাবর যখন মাটি খুঁড়ছে ব্যাটারিচালিত যন্ত্রটা, রাহুল মাত্রে বুঝতে পারলেন যে কম্পন আরও বাড়ছে। মাটির বুক থেকে সহস্র মৌমাছির সমবেত গুঞ্জনের মতো একটা আর্তস্বর উঠে আসছিল।

খানিক পরেই মাটি খোঁড়া থেমে গেল। ওপরে উঠে এল অত্যাধুনিক খননযন্ত্রটির লম্বা পাইপ আর কাটিং হেড। তারপর অটোমেটেড ক্লাচারের দুটো দীর্ঘ দাঁড়া নেমে গেল গর্তের মধ্যে।

একটু পরে যে জিনিসটা উঠে এল সেটাকে দেখে ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন রাহুল মাত্রে।

পুরো মূর্তিটা একটা নীল স্ফটিকের তৈরি। গায়ে মাটি লেগে থাকা সত্ত্বেও নীলাভ আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছিল মূর্তিটির চারিপাশে। মোহগ্রস্তের মতো সেটি হাতে তুলে নিলেন রাহুল। তিনি জানেন এটি কার মূর্তি।

এঁর ব্যাপারে বিশদে লিখে গেছেন আজোবা। তবুও, মূর্তিটি দেখে বুকটা একবার ভয়ে কেঁপে উঠল অসমসাহসী কম্যান্ডোর।

ষড়ভুজ মহাকাল।

মূর্তিটির একটি মাথা, তিনটি চোখ এবং ছয়খানি হাত। মাথায় উত্তুঙ্গ জটাজূট, একটি সাপ ফিতের মতো সেটি বেঁধে রেখেছে। চুলের প্রান্ত হাওয়ায় উড়ছে আগুনের শিখার মতো। পরনে বাঘছাল, গলায় ঝুলছে নরমুণ্ডের মালা। বাহুতে ও পায়ে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। মূর্তির ডানদিকের তিনটি হাতে রয়েছে নরমুণ্ডের জপমালা, ডমরু এবং কর্ত্রি। বাঁ-দিকের তিনটি হাতে শূল, বজ্রপাশ এবং নরকপাল। ডান হাতের কর্ত্রি এবং বাঁ-হাতের নরকপাল বুকের কাছে জড়ো করা। তিনটি রক্তাভ চোখে ফুটে উঠেছে মহাক্রোধবহ্নি।

নির্নিমেষে মূর্তিটির দিকে চেয়েছিলেন রাহুল। এমন ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর মূর্তি কমই দেখেছেন তিনি। যে অজানা শিল্পী এই অসামান্য শিল্পকর্মটি তৈরি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই দৈবী অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

খানিকপরেই সচেতন হয়ে উঠলেন রাহুল। এইবার শেষ কাজ।

আজোবার ডায়েরি অনুযায়ী, যে পুঁথিটির অধিকার নিয়ে এই মহা অনর্থ, সেটি লোবসাং আই বি চীফের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি বিশেষে কারণে।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে লোবসাং-এর এক পূর্বপুরুষ গুরু পদ্মসম্ভবের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। কী জাতীয় অনুগ্রহ সেটা পুঁথি পড়ে বোঝা দুষ্কর। তবে এইটুকু জানা যায় যে লোবসাং-এর পূর্বপুরুষের অনুরোধে পদ্মসম্ভব একটি জটিল ও দুরূহ তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি লিখে রেখে যান যে দেড় হাজার বছর পর নিয়তির বিধানে সেই পূর্বপুরুষের আত্মা মুক্তিলাভ করবে।

কিন্তু সেই মুক্তিলাভ করার পথে একটা বাধা আছে।

গুরু পদ্মসম্ভব তাঁর তন্ত্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ স্থানে অবরুদ্ধ করে রেখে যান। তিনি তাঁর পুঁথিতে পূর্ব ভারতে হিমালয়ের পাদদেশের সেই বিশেষ স্থানটির ইঙ্গিতও দিয়ে গেছেন।

তিনি এও লিখেছেন যে দেড় হাজার বছর পর কোনও এক ঐশীশক্তির ক্ষমতাবলে ওই একই স্থানে তাঁর কৃত ক্রিয়াটি পুনরায় ঘটমান হবে। তখনই মুক্তিলাভ করবে লোবসাং-এর পূর্বপুরুষের আত্মা।

কিন্তু ক্রিয়াটির সূচনা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেইটি সম্পন্ন না করলে তন্ত্রক্রিয়াটি সচল হবে না। পদ্ধতিটিও তিনি বিশদে লিখে গেছেন।

তাঁর আদেশ অনুযায়ী ঠিক দেড় হাজার বছর পরে গিয়াৎসো পরিবারের কোনও উত্তরাধিকারীকে বা তার পরম বিশ্বস্ত কাউকে সেখানে গিয়ে তাঁর লিখিত পদ্ধতি অনুসারে ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত করতে হবে। তবেই লোবসাং এর সেই পূর্বপুরুষের আত্মার মুক্তি ঘটবে।

আত্মার মুক্তি তিব্বতীদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হাজার বছর ধরে লোবসাং-এর পরিবারের প্রতিটি পুরুষ জানে যে অমুক দিনে অমুক জায়গায় গিয়ে একটি বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, তবেই তাদের সেই আশীর্বাদধন্য পূর্বপুরুষের আত্মা নির্বাণপ্রাপ্ত হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মনে রেখেছে সেই আদেশ, আর জানিয়ে গেছে তার উত্তরপুরুষদের। তার সঙ্গে তারা সযত্নে আগলে রেখেছে সেই পুঁথি।

লোবসাং-এর কোনও সন্তান না হওয়ায় সন্ন্যাস নেয় সে। তারপরেই গুরু রিন পো চে'র স্বহস্তে লেখা পুঁথিটি সে তুলে দেয় হিজ হোলিনেস দলাই লামা'র হাতে। দলাই লামা'র থেকে পরম বিশ্বস্ত আর কে আছে তিব্বতীদের কাছে? নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ করবেন সেই আরব্ধ কর্ম। লোবসাং-এর পরিবার আগে থেকেই দলাই লামা'র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিল। এরপর তার স্থান হয় দলাই লামার একদম ঘনিষ্ট বৃত্তের মধ্যে।

পরিস্থিতি পালটে যায় চীনের তিব্বত আক্রমণের পর। দলাই লামা'র সঙ্গে লোবসাংকেও পালিয়ে আসতে হয় ভারতে। লোবসাং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে যে পরম মহিমান্বিত দলাই লামা, যাঁর আদেশ ছাড়া তিব্বতের আকাশে চন্দ্র সূর্য ওঠে না, তিব্বতের প্রতিটি আত্মা যাঁর আশীর্বাদ ছাড়া নিঃশ্বাস নেয় না, যাঁর অজানিতে তিব্বতের কোনও শুভাশুভ কর্ম সম্পন্ন হয় না, তিনিও সাধারণ মানুষের মতোই সমান অসহায়। প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশি শক্তির সামনে তাঁর কোনও দৈবী বা ঐশী শক্তির কোনও জোরই খাটে না।

সেই থেকে অমূল্য পুঁথিটির নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন লোবসাং। তিনি চেয়েছিলেন যে চীনের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এমন এক শক্তির হাতে তাঁদের পরিবারের আরব্ধ কর্মের উত্তরাধিকার সঁপে যেতে।

তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ভারতের নিরাপত্তা আই বি'র হাতেই সমর্পিত। তখনই তিনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন আই বি'র সঙ্গে। আর সেই কাজে তিনি সাহায্য নেন...

হাঁটু গেড়ে মাথা মূর্তিটিকে নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন রাহুল। হঠাৎ করেই যেন ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তিনি।

এসেছে, অবশেষে আজ এসেছে সেই সময়। লোবসাং গিয়াৎসো মারা যাওয়ার আগে তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু রতনলাল মাত্রে'র হাতেই সঁপে যান তার আরব্ধ কর্মের ভার। এর থেকে মধুর প্রতিশোধ বোধহয় আর

হয় না।

সত্তর বছর। সত্তর বছর ধরে রতনলালের ছেলে অশোকরাও মাত্রে, আর অশোক রাওয়ের ছেলে রাহুল অশোকরাও মাত্রে এই দিনটারই অপেক্ষায় ছিলেন। দ্য ডে অফ রিডেম্পশন।

মূর্তিটি চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে রাখলেন রাহুল। তার ওপর মেলে ধরলেন নিজের বাম বাহুখানি। তারপর পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বার করে অতি যত্নে নিজের বাঁ-হাতের কনুই থেকে কবজি বরাবর একটানে কেটে ফেললেন।

ফিনকি দিয়ে উঠল রক্তের ধারা। মনে হল যেন সেই রুধির স্রোত স্নান করিয়ে দিচ্ছে নীলাভ মহাকাল মূর্তি। এর সঙ্গে সঙ্গে কোন এক অজানা ভাষায় দ্রুতস্বরে মন্ত্র আউড়ে যেতে লাগলেন রাহুল।

মন্ত্রপাঠ শেষ হওয়ার পর ষড়ভুজ মহাকালের মূর্তিটা উলটো করে সযত্নে গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলেন রাহুল মাত্রে। তারপর মাটি ফেলতে লাগলেন গর্তের মধ্যে।

গর্তের মধ্যে মাটি ফেলা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দুই হাত তুলে আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। দু-চোখের কোনায় চিক চিক করছিল অশ্রুবিন্দু।

আপনি শান্তি পেয়েছেন তো লোবসাং গিয়াৎসো? ক্ষমা করেছেন আমার ঠাকুরদাকে? যাকে আপনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন, আপনার সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু'র রক্তের উত্তরাধিকারী আজ আপনার পরিবারের আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করেছে। আজ আপনি তৃপ্ত তো?

সেই গহীন রাত্রির বুক চিরে, আকাশের নীল তারার আলোপথ ধরে যেন গহীন এক শান্তি নেমে এলো রাহুল মাত্রের বুকে। কে যেন গম্ভীর সুরে বলে উঠল, 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু। অবেরা হোন্তু। অব্যাপজ্ঝা হোন্তু...'

ফেরার পথ ধরলেন রাহুল। রক্তের ঋণ রক্তেই শোধ।

*

দুপুর আড়াইটে। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকাল উইং, সংক্ষেপে 'র'-র সদর দপ্তরের মস্ত বড় কনফারেন্স রুমেও তখন বিরাজ করছিল অস্বস্তিকর নীরবতা।

'কাদের কাজ হতে পারে ত্রিপাঠীজি? আই এস আই? এন এস আই? মোসাদ? এম আই ফাইভ? এস ভি আর? সি আই এ?' টেবিলের একপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাডভাইজর আশিস সিনহা।

টেবিলের অপরপ্রান্তে বসেছিলেন ছোটখাটো দোহারা চেহারার এক মধ্যবয়সি মানুষ। অতি সাধারণ দৈহিক গঠন, এবং সাধারণতর পোশাক পরিহিত মানুষটির সারা শরীরে দর্শনীয় শুধুমাত্র অত্যুজ্জ্বল চোখদু'টি। খর্বকায় মানুষটির সমস্ত আত্মা যেন শুধুমাত্র ওই চোখদু'টিতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

ভদ্রলোকের নাম হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী। ইনিই 'র'-র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সারা পৃথিবীর ইন্টেলিজেন্স মহল যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ওঁকে ডাকে দ্য চিফ বলে।

ধীরে, অনুত্তেজিত সুরে বলতে শুরু করেন চিফ, 'কাদের কাজ সেটা বলা মুশকিল। ইনফ্যাক্ট কাল রাতে ঠিক কী হয়েছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। প্রফেসর বোসের ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, সেটা প্রায় তিনি কমপ্লিট করে এনেছিলেন। চূড়ান্ত পরীক্ষাটা কালই করার কথা ছিল। সেই মতো আমরা ফাইনাল 'গো অ্যাহেড' পাঠাই ওঁর কাছে।'

'কালকেই কেন?' প্রশ্ন করলেন আই বি'র ডিরেক্টর দিবাকর সিং। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব আই বি-র। তা সত্ত্বেও এই টপ সিক্রেট মিশনটা র-কে দেওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তিনি। বস্তুত ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর সিনহা, ত্রিপাঠী ওরফে দ্য চিফ, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সির বস লেফটেন্যান্ট

জেনারেল বিভোর ব্যানার্জি, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জির প্রধান প্রফেসর নারায়ণস্বামী আর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর এর ব্যাপারে কেউই বিশেষ কিছু জানতেন না!

'কারণ কালকেই প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল।' বলতে থাকেন দ্য চিফ, 'চূড়ান্ত পরীক্ষাটা করার আইডিয়াল সময়। রাস্তায় লোকজন থাকবে না, আলো বা আওয়াজ কিছুই দূর থেকে দেখা বা শোনা যাবে না।'

'পরীক্ষাটা কী, সে বিষয়ে কিছু জানা যাবে?' প্রশ্ন করলেন ডিরেক্টর সিং।

'আমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি।' মুখ খুললেন প্রফেসর নারায়ণস্বামী। বর্ষীয়ান বিজ্ঞানীর নাম পার্টিকল ফিজিক্সে প্রথম সারির পাঁচজনের নামের মধ্যেই উচ্চারিত হয়।

'আপনারা লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের নাম শুনেছেন? বা সার্ন বলে কিছু জানেন?'

'শুনেছি প্রফেসর।' শান্ত গলায় বলেন দ্য চিফ, 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি যদি আপনি বিস্তারিতভাবে বলেন, তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হই।'

সবাই নড়েচড়ে বসলে বলতে শুরু করলেন বয়স্ক প্রফেসরটি।

'সার্ন একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা, পুরো নাম ইওরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ। সংস্থাটি তৈরি হয় উনিশশো আটানব্বই সাল নাগাদ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম সায়েন্টিফিক প্রজেক্টটি এক্সিকিউট করা।

বৃহত্তম বলছি, কারণ প্রায় দশ হাজার বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ার এর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আছেন। একটিমাত্র সায়েন্স প্রজেক্টে এতজন বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ একসঙ্গে আর কখনও কাজ করেননি। ম্যানহাটন প্রজেক্টও এর কাছে শিশু। ভারতবর্ষেরও অনেক বৈজ্ঞানিক সংস্থা এর সঙ্গে যুক্ত, যেমন টি আই এফ আর, সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, আমি যেখানে পড়াতাম, সেই হরিশ্চন্দ্র রিসার্চ ইন্সটিটিউট ইত্যাদি।'

'এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্যটা একটু বুঝিয়ে বলুন প্রফেসর।' অনুরোধ করেন দ্য চিফ।

'এই প্রজেক্টের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্টিকল ফিজিক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন থিওরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা। তাতে করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন রহস্যের সমাধান হতে পারে। যেমন ধরুন, হিগস বোসন কণা, যাকে গড পার্টিকল বা ঈশ্বর কণা বলা হয়, তার খোঁজ পাওয়া।

সেই উদ্দেশ্যেই দু'হাজার সাল নাগাদ ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড সীমান্তে, মাটির একশো মিটার নীচে সাতাশ কিলোমিটার লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বসানো হয় পাইপের মতো একটি যন্ত্র। এটিই হল আজ অবধি পৃথিবীতে তৈরি সবচেয়ে বড় আর শক্তিশালী পার্টিকল কোলাইডর, যার নাম এল এইচ সি বা লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডর।'

'তাতে লাভ?' এবার প্রশ্ন করেন মিস্টার সিনহা, 'মানে এত খরচাপাতি করে এইসব এক্সপেরিমেন্ট করার উদ্দেশ্যটাই বা কী?'

'সৃষ্টির কতগুলো মূলতত্ত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।' সামান্য বিরক্ত শোনায় প্রফেসর নারায়ণস্বামীর কণ্ঠস্বর, 'যেমন ধরুন, হাই এনার্জি পার্টিকলের স্বভাবচরিত্র স্ট্যান্ডার্ড মডেল দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, নাকি তার জন্য হিগস-লেস মডেল দরকার। স্ট্রিং থিওরির এক্সট্রা ডাইমেনশনের তত্ত্বটা ভুল, না ঠিক। তারপর ধরুন, মহাবিশ্বের মাস এনার্জির পঁচানব্বই শতাংশ দখল করে রেখেছে যে ডার্ক ম্যাটার তার নেচারটাই বা কী ধরনের? চারটি মৌলিক ফোর্সের মধ্যে চতুর্থটি, মানে গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ বাকি তিনটি মৌলিক ফোর্সের তুলনায় এত মৃদু কেন? অথবা ধরুন কোয়ার্ক গ্লুওন প্লাজমার প্রপার্টি বলতে...'

'বুঝেছি-বুঝেছি!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ডিরেক্টর সিং, 'আর বলতে হবে না। কিন্তু এর সঙ্গে কালকের ঘটনার সম্পর্কটা কী?'

'এই এক্সপেরিমেন্টের একটা বিশেষ দিক নিয়ে কাজ করতে সার্নের কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের, মানে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জিকে। সেই উদ্দেশ্যেই নর্থ বেঙ্গলের একটা নিরালা জায়গায় এই ফেসিলিটিটা তৈরি করা হয়।'

'কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে এত সিক্রেসি মেন্টেন করার কী আছে প্রফেসর? এমন সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট তো রোজই হাজার গণ্ডা হচ্ছে দেশে।' বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করেন সিং।

'তার কারণ,' শান্তস্বরে বলে ওঠেন চিফ, 'এক্সপেরিমেন্টটা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকী জাতীয় নিরাপত্তা ব্যাপারটাও জড়িত আছে এর সঙ্গে।

সার্নের পক্ষ থেকে অনুরোধটা সরাসরি করা হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বিষয়টার গাম্ভীর্য বিচার বিবেচনা করে এর সিকিওরিটির দায়িত্ব তুলে দেন 'র'-র হাতে। যেহেতু এই এক্সপেরিমেন্টটার ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, এবং এর বিন্দুমাত্র ভুলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা, তাই যথাসম্ভব গোপনে এর ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

'কীরকম ক্ষয়ক্ষতি?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করেন ডিরেক্টর সিং।

'যেমন ধরুন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া।' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দেন প্রফেসর নারায়ণস্বামী।

ঘরে হাজির অধিকাংশ অফিসার সম্ভবত বুঝতে পারছিলেন না, এই কথাটায় কী প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। লেফট্যানেন্ট জেনারেল ব্যানার্জিই আগে সামলে নিলেন। তারপর গলা খাঁকড়ে জিগ্যেস করলেন, 'এই এক্সপেরিমেন্টের ফলে পৃথিবী ঠিক কীভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে একটু বিশদে জানাবেন প্লিজ? মানে নর্থ বেঙ্গলের ওই ছোট্ট ফেসিলিটিতে নিশ্চয়ই শ'খানেক অ্যাটম বম্ব তৈরি হচ্ছিল না। তাহলে কীসের জন্যে এত ভয়?'

'ওখানে কেউ মারণাস্ত্র তৈরি করতে বসেনি জেনারেল ব্যানার্জি।' গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন প্রফেসর নারায়ণস্বামী, 'ওখানে প্রফেসর বোস খুবই ছোট, কিন্তু অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটি সাইলেক্ট্রোপ্রোটন যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই যন্ত্রটি শুধুমাত্র এই গবেষণার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে, এর আর কোনো জুড়ি নেই।'

'তা আপনার এই সাঁইবাবা না কার যন্ত্রে এমনকী তৈরি হচ্ছিল প্রফেসর,' বিস্মিত স্মরে প্রশ্ন করেন সিনহা সাহেব, 'যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে?'

একটিমাত্র শব্দে উত্তর দেন বর্ষীয়ান প্রফেসর, 'অ্যান্টিম্যাটার।'

'অ্যান্টিম্যাটার!' বিস্ময় ফুটে বেরোয় ব্যানার্জি'র গলায়, 'সেটা কী জিনিস?'

'পার্টিকল ফিজিক্সের দুনিয়ায় অ্যান্টিপার্টিকল বা অ্যান্টিম্যাটার একটি অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং বস্তু।' প্রফেসরি ঢঙে বলতে থাকলেন নারায়ণস্বামী, 'এর প্রতিটি অ্যাটমের ধর্ম ও চরিত্র আমাদের চেনা দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর সম্পূর্ণ উলটো। এবং বিন্দুমাত্র ম্যাটার আর আন্টিম্যাটার পরস্পরের সংস্পর্শে এলে যে বিপুল পরিমাণ এনার্জি উৎপন্ন হয় তা কয়েকশো হিরোশিমার সমান।'

কয়েক মুহূর্তের অস্বাভাবিক নীরবতা। কেউ একজন প্রশ্ন করেন, 'এমন ভয়ানক এক্সপেরিমেন্ট করার ভার আমাদের দেওয়াই বা হল কেন?'

'তার কারণ প্রফেসর হিতেশরঞ্জন বসু এখনও এই দেশেই গবেষণা করেন বলে। পার্টিকল ফিজিক্সের দুনিয়ায় অ্যান্টিপার্টিকল বা আন্টিম্যাটার নিয়ে গবেষণায় হিতেশের থেকে বড় আর কোনো এক্সপার্ট এই মুহূর্তে দুনিয়ায় আর দুটি নেই।'

'কিন্তু প্রফেসর,' অধৈর্য কণ্ঠে বলেন সিনহা, 'ওই এক্সপেরিমেন্টে এমন কী ঘটল যে এতগুলো লোক উধাও হয়ে গেল?'

'সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। তবে কিছু তো একটা হয়েছে। আপনাদের গোয়েন্দারা কী বলছে চিফ?'

'কারও কাছে কোনো খবর নেই।' উত্তর দেন দ্য চিফ। 'আই বি, র, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি---এদের কারও কাছে কোনো ক্লু নেই। আজ দুপুর থেকে আমাদের ইলেকট্রনিক সারভেইলেন্স এক্সপার্টরা পাগলের মতো তন্নতন্ন করে পুরো সাউথ ইস্ট এশিয়ার সমস্ত টপ লেভেলের সিক্রেট কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করছে। তাদের কাছ থেকেও কোথাও কোনো খবর নেই।'

ঘরে নৈঃশব্দ্য ঘন হয়। প্রবীণ অভিজ্ঞ আমলা শান্ত গলায় বলে চলেন।

'বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান, চিন, পাকিস্তান, মায় পুরো সি আই এস কান্ট্রিগুলোতে আমাদের যত আন্ডারকভার এজেন্ট আছে তাদের অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে এখনও অবধি, মানে এই মিটিঙে ঢোকা অবধি আমি কোনো খবর পাইনি। মনে হয় না এর মধ্যে কোনো বিদেশি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির হাত আছে।'

'তাহলে? ওখানে কী হয়েছে সেটা কী করে জানা যাবে?' প্রশ্ন করেন ব্যানার্জি, 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?'

'এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্যে একজনকে বিশেষভাবে সিলেক্ট করেছি।' সামনে ঝুঁকে পড়েন দ্য চিফ, 'তিনি হলেন প্রফেসর শঙ্কর গাঙ্গুলি।'

নামটা শুনেই প্রবল গুঞ্জন উঠল মিটিং রুমে। সবার আগে শোনা গেল প্রফেসরের বিস্মিত কণ্ঠস্বর, 'শঙ্কর? আপনি সবকিছু জেনেশুনে ঠিকঠাক ডিসিশন নিচ্ছেন তো মিস্টার ত্রিপাঠী?'

'আপনার কি ওঁর দক্ষতা নিয়ে সংশয় আছে প্রফেসর?' চিফের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

'না-না!' নারায়ণস্বামী ব্যাখ্যা করেন, 'হি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড নো ডাউট, কিন্তু সেইরকমই একসেন্ট্রিক, উগ্র, একগুঁয়ে, আর জেদি।'

'কীরকম?' কৌতূহলী শোনায় লেফটেন্যান্ট ব্যানার্জির গলা।

'অদ্ভুত-অদ্ভুত সব থিওরি প্রপোজ করার জন্যে আমরা সবাই এমনিতেই ওকে একটু এড়িয়ে চলতাম। প্রায় বছর পাঁচেক আগে আটলান্টাতে থিওরেটিকাল ফিজিসিস্টদের নিয়ে একটা সায়েন্স কংগ্রেস হয়েছিল। সেখানে শঙ্কর টাইম ট্রাভেল নিয়ে একটি অত্যন্ত উদ্ভট পেপার প্রেজেন্ট করে বসে। সেটা এতই অবাস্তব যে শুনলে মনে হয় সায়েন্সের পেপার নয়, কোনো ফ্যান্টাসি স্টোরি।

সাড়া হলে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। এম.আই.টি.-র প্রফেসর অ্যাণ্ড্রু জনস্টন ভারতীয়দের মেধা ও জাতীয় চরিত্র নিয়ে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর উক্তি করেন। আগেই বলেছি, শঙ্কর খুবই রগচটা লোক। ওখানেই সে প্রফেসর জনস্টনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বহু কষ্টে শঙ্করের হাত থেকে প্রফেসর জনস্টনকে উদ্ধার করা হয়। সেই থেকে সায়েন্স কমিউনিটি শঙ্করকে মোটামুটি বয়কটই করে। তারপর থেকেই শঙ্কর প্রায় অদৃশ্য। তার কোনো খোঁজই পাইনি আমরা। কিন্তু আপনারা তাকে পেলেন কোথা থেকে?'

'হাউ ট্যালেন্টড ইজ দিস জেন্টলম্যান?' প্রশ্ন করলেন ডিরেক্টর সিং।

স্থির চোখে ডিরেক্টর সিং-এর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নারায়ণস্বামী। তারপর শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মতে, হাউ প্রেস্টিজিয়াস ইজ দ্য নোবেল প্রাইজ, মিস্টার সিং?'

'হাইলি, ইফ নট মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস।' কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার সিং, 'এই নিয়ে কোনো সংশয় নেই।'

'তাহলে শুনে রাখুন। আজ ভারতবর্ষ থেকে ফিজিক্সে যদি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অন্তত একজনও দাবিদার থাকে, তবে তার নাম শঙ্কর গাঙ্গুলি।'

সাড়া হল জুড়ে স্তব্ধতা নেমে এল।

'কিন্তু উনি কি রাজি হবেন?' সংশয় প্রকাশ করেনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ব্যানার্জি।

'হয়েছেন।' জোর দিয়ে জানান দ্য চিফ, 'অবশ্য না হয়ে ওঁর কোনো উপায়ও ছিল না।'

'কেন?' উৎসুক হন ডিরেক্টর সিং।

'প্রফেসর হিতেশরঞ্জন বসু ছিলেন এই পৃথিবীতে শঙ্করের একমাত্র বন্ধু। ওঁদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কও আছে। শঙ্কর বিয়ে করেছিলেন হিতেশের একমাত্র বোনকে।

শঙ্করের ছেলের বয়েস যখন তিন বা চার, তখন কোনো কারণে তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায়। তারপর থেকে দুই বন্ধুর মধ্যে কমপ্লিট ছাড়াছাড়ি।

লোকে বলে তার পর থেকেই নাকি শঙ্কর একটু পাগলাটে হয়ে যায়। এমনকী ছেলেকে দেখতেও আসত না নিয়মিত। তবে শঙ্করকে পাঠানোর পেছনে এর থেকেও বড় একটি কারণ আছে।' ঠান্ডা গলায় বলেন হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী।

'সেটা কী?'

'হিতেশের বোন অতি কষ্টে, অনেক অভাবের মধ্যেও ছেলেকে মানুষ করেন। শঙ্করের সেই সন্তান বড় হয়ে একজন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিমান ফিজিসিস্ট হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার অদ্ভুত প্রতিভা পেয়েছে ছেলেটি। পদার্থ বিজ্ঞানে আশ্চর্য বুৎপত্তি নিয়ে জন্মেছে সে।

আমাদের সৌভাগ্য যে এই মুহূর্তে সে ছেলে ওই অঞ্চলে উপস্থিত রয়েছে। এই রহস্য ভেদ করতে হলে তাকে ছাড়া আমাদের চলবেই না। এই সিক্রেট মিশনে সেইই হতে পারে আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহকারী।'

'তার কী নাম, চিফ?'

'সুজন।' অল্প হাসলেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটি, 'হিতেশের ভাগ্নে তথা শঙ্করের ছেলের নাম সুজন গাঙ্গুলি।'

*

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল সে। নাকি ভেসে ছিল? আশেপাশের অন্ধকার এমন নিকষ কালো যে তার মাথার মধ্যে কোনো দিক, স্থান বা কালের কোনো বোধ কাজ করছিল না। এই অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে কেউ গেঁথে দিয়েছে তাকে।

প্রথমে সে হাত-পা নাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। কোনো সাড় পায় না। তার মনে হয়, 'আমি আছি' এই বোধ ছাড়া আর কিছুই বেঁচে নেই শরীরে। চোখ নেই, হাত নেই, পা নেই, মাথা নেই, শরীর নেই, কিচ্ছু নেই। সেই গাঢ়, নিঃসীম বোধশূন্যতার মধ্যে শুধু অন্ধকার প্রদীপটির মতো জেগে আছে একটি মাত্র জিনিস।

তার জাগ্রত চৈতন্য।

প্রথমে ভয় পেয়ে যায় সে। প্রবল ভয়! এ কোথায় সে? কেউ কি তাকে আটকে রেখেছে কোথাও? হাত-পা বেঁধে মাটির নীচে জীবন্ত পুঁতে দিয়ে গেছে? সে কি আর বেঁচে নেই?

প্রবল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে যায় সে। কিন্তু তার গলায় কোনো শব্দ ফোটে না! চিৎকার করার সেই প্রবল ইচ্ছে যেন তার নিজের চৈতন্যের ওপরেই বিপুল সমুদ্র হয়ে আছড়ে পড়ল। মরণাপন্ন মানুষের মতো ছটফট করে উঠতে চাইল সে। প্রবল ইচ্ছেয় যেন মুচড়ে যেতে চাইল তার প্রতিটি স্নায়ু।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে এল তার বোধশক্তি।

কিছুক্ষণ পর সে অনুভব করল, কিছু একটা হচ্ছে। তার সত্ত্বা যেন একটু-একটু করে প্রসারিত হচ্ছে। সেই অতলান্ত শূন্যতার মধ্যে তার বোধ আর চৈতন্য অতি ধীরে জমাট বেঁধে উঠছে, যেমনভাবে পাথরের গা বেয়ে উঠে আসে জীবন্ত জলজ শ্যাওলার ঝাঁক!

ধীরে ধীরে মনের ইচ্ছা সংহত করতে থাকে সে। নিজের সমস্ত বোধ একটিমাত্র বিন্দুতে স্থিত করার চেষ্টা করে। নিজের মগ্নচৈতন্যের গভীরে ডুব দেয় সেই যুবক।

কিছু সময় পর সে বুঝতে পারে, তার বিদেহী চৈতন্যবিন্দু ঘিরে যেন এক শরীরী বোধ গড়ে উঠছে। শরীর নেই, তবু যেন তার সত্ত্বার মধ্যে কে যেন নির্দেশ পাঠাচ্ছে যে সে এখন মুক্ত। যেই নিকষ কালো ব্যপ্তির মধ্যে সে যেন এবার নড়াচড়ার ধারণা অনুভব করে।

ধীরে ধীরে এগোবার চেষ্টা করে সে।

সেই অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোর পথে তার স্মৃতি জাগ্রত হয় তিল-তিল করে। একের পর এক দৃশ্য তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। সেগুলো কাটা-কাটা নয়। বরং একটা দৃশ্যের সঙ্গে যেন

জড়িয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে আর একটা দৃশ্য। ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতির কোলাজ ভেসে বেড়াচ্ছিল তার স্মৃতির পর্দা জুড়ে।

শুয়ে ছিল সে...কে যেন হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকল অনেক দূর থেকে... উদ্ভ্রান্তের মতো উঠে বসেছিল সে... চটিটা পায়ে গলিয়ে বাইরে আসতেই...

দৃশ্য পালটে যায়। নদীর পাশে একটা বড় বাড়ি। দূরে পাহাড়...নদীর পাড়ে কারা যেন বসে আছে... কথা বলছে... ওই তো, সে নিজেও আছে তাদের মধ্যে...

আবার পাল্টে যায় দৃশ্যপট। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘন জঙ্গল...তার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে এক অশরীরী ছায়া...তাকে চেনা চেনা লাগে... পাহাড়ি রাস্তা... সাদা বাড়ি... নদীর ধারে বাড়ি...ঝরনা...

সেই অশরীরী ছায়ার পেছন পেছন এগিয়ে যাচ্ছে সে! অন্ধের মতো, উদ্ভ্রান্তের মতো সেই ছায়াকে অনুসরণ করে চলেছে... পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল... সেই জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে সে!

কোথায় হারিয়ে গেছে সে? এই তো সেই বাড়ি... বাড়িটার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে... জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি... চাতাল... চাতালের ওপর অনেক লোক.. বাড়িতে অনেক লোক...ঝড়...অনেক লোক...চাতালে...মশাল...কী যেন নেমে আসছে...দৌড়ে যাচ্ছে ও...বাড়িটা যেন হঠাৎ ধেয়ে আসা ঝড়ের মতো গিলে খেতে আসছে ওকে...

তারপর শূন্য। সব শূন্য।

নিজের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয় সে যুবক। চেষ্টা, আরও চেষ্টা করতে থাকে। তীব্র ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে দেয় ছোটোবেলার সমস্ত ভালোলাগার মুহূর্তগুলো।

ছ'বছর বয়েস। মা কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াচ্ছেন। লোডশেডিং। মৃদু স্বরে গাইছেন, 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে, ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।'

প্রথম বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ। প্রথম দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘা-র ওপরে সোনা ঢেলে দিচ্ছে সূর্যের আলো।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট। রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে সে। কে যেন একজন মা-কে জড়িয়ে ধরে বললেন 'আপনি তো রত্নগর্ভা, দিদি।' মা কিছু বলছেন না, ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। আর সে অনুভব করছে, এক সমুদ্র ভালোবাসা যেন নরম চাদরের মতো ওমে ঘিরে ধরেছে তাকে।

সেকেন্ড ইয়ার। কফি হাউস। কাজলরঙা মেয়েটি মৃদু স্বরে আবৃত্তি করছে, 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে, ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী...!'

নেটের রেজাল্ট বেরোনোর দিন। মামা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন, 'বাপকা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া...আর কিছু না হোক, হতচ্ছাড়ার রক্তের গুণটা তো আছে!'

দেবাদিত্য... একসঙ্গে বাইক চালিয়ে দিঘা... রাতভর আড্ডা... জেনেভা... ফেয়ারওয়েল পার্টি... প্রফেসর কাগুয়োচি আড়ালে ডেকে বলছেন, 'জয়েন আস ইন হার্ভার্ড, ইয়ংম্যান। এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স নিডস ইউ...!'

ঠিক এইসময়েই তার সত্ত্বার মধ্যে মৃদু, অতি মৃদু স্বরে জেগে উঠল কারও স্বর। দূর থেকে ক্ষীণ তরঙ্গ ধাক্কা দিল তার চেতনার পর্দায়, 'সুজন! সুজন, একী? তুই...তুই এখানে?'

শোনামাত্র আরও তীব্র করল সে তার চিৎশক্তি। মনের সমস্ত জোর সংহত করে ছুড়ে দিল চিন্তাতরঙ্গ, 'মামা, তুমি! তুমি এখানে? কোথায় আছ মামা? আমরা কোথায় আছি? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'হা ঈশ্বর! সুজন, তুই এখানে এলি কী করে? তুই কি আছিস? বুঝতে পারছিস আমার কথা?'

'আছি মামা। কিন্তু এ কোন জায়গা? আমরা কোথায়? চারপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমার হাত-পা শরীর এসব কিছুই অনুভব করতে পারছি না কেন? কথা বলতে পারছি না কেন? আমার ভয় করছে মামা।'

'ভয় পাস না সুজন। মাথা ঠান্ডা রাখ। কোথায় আছি সেটা নিশ্চিত হয়ে বলার মতো সময় আসেনি এখনও। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে তীব্র ইচ্ছাশক্তি ছাড়া এখানে কিছুই করা যায় না। মনের শক্তিকে সংহত কর সুজন। এছাড়া এখানে কমিউনিকেট করার কোনো উপায় নেই।'

'কিন্তু মামা, এ কোন অদ্ভুত জায়গায় আছি আমরা? আমরা এখানে এলামই বা কী করে? তুমি ব্রাইটনে কয়েক মাসের জন্য পড়াতে গেছিলে না?'

'না রে। আমি তোদের ভুল বলেছিলাম। একটা খুব সিক্রেট এক্সপেরিমেন্ট করতে এসেছিলাম এখানে। তারপর...সে এক লম্বা গল্প! কিন্তু তুই? তুই এখানে এলি কী করে?'

'বন্ধুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসে জড়িয়ে পড়েছি মামা। কিন্তু তুমি কিসের এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছ?'

'ক্যালিব্রেশনে একটা ছোট্ট ভুল, আর তার ফলে এক্সপেরিমেন্টটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল, ব্যস, এই অবধিই মনে আছে রে। তারপর যে কী হল, সে আমিও বুঝতে পারছি না। তবে...অনুমান করতে পারি।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মামা। কী এক্সপেরিমেন্ট? কোন অনুমানের কথা বলছ তুমি?'

'এক্সপেরিমেন্টটার কথা তো তোকে বলতেই হবে এখন। তবে এতদিনে মনে হচ্ছে, ওই পাগলটার থিওরিই বোধহয় ঠিক।'

'পাগল? কোন পাগল?'

'তোর বাবা। শঙ্কর গাঙ্গুলি।'

*

শিলিগুড়ির একটা হোটেলের প্রায়ান্ধকার রুমে তিনজন অসমবয়সি মানুষ মাথা নীচু করে বসেছিলেন। তাঁদের একজন তরুণ, আরেকজন মাঝবয়েসি, শেষজন বয়সে প্রৌঢ়। ভেতরে এসি চলছিল মৃদু আওয়াজ তুলে। রাস্তার লোকজন, রিকশা, গাড়িঘোড়ার ক্ষীণ আওয়াজ বন্ধ কাচের ওপার থেকে রুমের ভেতর ভেসে আসছিল।

দেবাদিত্য আর কৃষ্ণদা যখন এখানে এসে পৌঁছয় তখন প্রায় বেলা এগারোটা। কৃষ্ণদা যেন জানতেনই যে এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কোথায় পাওয়া যাবে। দেবুকে তিনিই টেনে এনেছেন সঙ্গে করে। সুজনের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এইমাত্র। সেই দুঃসংবাদটাই যেন এই কোলাহলমুখরিত দুপুরের মধ্যে পাথরচাপা স্তব্ধতা হয়ে চেপে বসেছিল তিনজনের বুকে।

প্রথম প্রশ্ন করলেন প্রৌঢ় পুরুষটি, 'একটা জলজ্যান্ত ছেলে হারিয়ে গেল? কীভাবে?'

'জানি না আঙ্কেল।' ভাঙা স্বরে বলে দেবাদিত্য। চোখ-মুখ বসে গেছে তার, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, বারবার শুকনো ঠোঁট চাটছে।

'আমাদের প্ল্যান ছিল, রাতের অন্ধকারে আমরা দুজনে একবার ওই বাড়িটার কাছে যাব, যদি চুপিচুপি ঢোকা যায়।' বলে চলে দেবাদিত্য, 'আমাদের মনে হচ্ছিল, বাড়িটার মধ্যেই হয়তো এই রহস্যের সমাধান সূত্র আছে।

সেইমতো আমরা রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়েও পড়ি। কথা ছিল, মাঝরাতে সুজন আমাকে ডেকে দেবে, তারপর আমরা বেরোব। কিন্তু আমার ঘুম ভাঙে একেবারে সেই ভোরবেলায়। উঠে দেখি ও নেই... তারপর...'

'আর ইউ কিডিং?' রাগে ফেটে পড়েন প্রৌঢ়, 'কী ভেবেছিলে, ওখানে কোনো সিকিওরিটি নেই? জায়গাটা এমনি এমনি খোলা পড়ে থাকবে, যাতে তোমরা গিয়ে রাতের বেলা 'অ্যাডভেঞ্চার' করবে? এত বয়েস হয়েছে, মাথায় সাধারণ বুদ্ধিটুকু অবধি নেই?'

'না, মানে...' আমতা-আমতা করতে থাকে দেবু, 'আসলে ইনি বলেছিলেন যে সেই ঝড়জলের রাতে ওই বাড়িটায় যেন কী একটা...!'

'এঁর সঙ্গে পরে কথা বলছি। তুমি বলো, তারপর তুমি কী করলে?' কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেন প্রৌঢ়।

একবার ঢোক গিলল দেবু, তারপর বলল, 'আমি ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ওর বিছানা খালি। প্রথমে ভাবলাম আমাকে না ডেকে ও হয়তো একাই বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তারপর দেখি টর্চ, কিটব্যাগ, রিস্ট ওয়াচ, স্নিকার্স সব কিছুই পড়ে আছে। শুধু ঘরে পরার হাওয়াই চপ্পলটাই নেই। হাওয়াই চপ্পল পরে তো ওর বেশি দূর যাওয়ার কথা নয়।'

'কেউ ধরে নিয়ে যায়নি তো?' অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে প্রশ্নটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

'না আঙ্কেল। তাহলে তো আমি শব্দ পেতাম। তাছাড়া চা বাগানের দুজন গার্ড বারান্দায় শোয়। তারাও কোনো আওয়াজ পায়নি। বিছানায় বা চারপাশের কোথাও ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই। আর কেউ ওকে খামোখা ধরে নিতে যেতে চাইবেই বা কেন?'

'স্ট্রেঞ্জ! ছেলেটা হাওয়াই চপ্পল পরে বেরিয়ে জাস্ট হারিয়ে গেল?'

ঘটনাটা আরও বিশদে জানায় দেবু। ঘুম থেকে উঠে সুজনকে বিছানায় না দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিল সে। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, সুজন তাকে না জানিয়েই হয়তো ওই যন্তরমন্তরের কাছে গেছে।

সময় নষ্ট না করে তক্ষুনি-তক্ষুনি গার্ডের সাইকেল চালিয়ে বাড়িটার কাছে গেছিল সে। কিন্তু সেখানে সুজনের কোনো খোঁজ তো সে পায়ইনি, উপরন্তু সিকিউরিটি ওকে দেখামাত্র ভাগিয়ে দেয়। পুলিশে অভিযোগ জানাবে কি না ভাবতে-ভাবতে ফিরে আসার সময়ই নদীর ধারে কৃষ্ণদা'র সঙ্গে দেখা। কেষ্টদা তাকে বারণ করেন পুলিশে যেতে। তিনিই একটা গাড়ি ধরে ওকে নিয়ে চলে আসেন শিলিগুড়ির এই হোটেলে।

'পুলিশে না যাওয়ার পরামর্শটা কি আপনি দিলেন?' ঘরে উপস্থিত তৃতীয় জনকে প্রশ্ন করেন শঙ্কর গাঙ্গুলি।

'হ্যাঁ।' ছোট করে উত্তর দেন মধ্যবয়সি মানুষটি। তিনি এতক্ষণ ধরে নিবিড়ভাবে শঙ্কর গাঙ্গুলিকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যে আপাত কঠিন এই মানুষটি ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। তাঁর ঘনঘন আঙুল মটকানো, ছটফট করা, দরদর করে ঘামতে থাকা সেসবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

'কেন? পুলিশে যেতে বারণ করলেন কেন?' তীক্ষ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন শঙ্কর।

'কারণটা বোধহয় আপনিও জানেন প্রফেসর সাহেব। আমার মন বলছিল, যে কারণে এই চেংমারি টি গার্ডেন বা লাল ঝামেলা বস্তি সংলগ্ন এলাকার লোকজন হঠাৎ করে হারিয়ে যাচ্ছে, আপনার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার পেছনেও সেই একই কারণ রয়েছে। সেটা পুলিশকে জানিয়ে বিষয়টা জটিল করে তোলার বদলে সরাসরি আপনাকে জানানোই বেটার, তাই না? আপনিও তো এই প্রবলেমটাই সলভ করতে এসেছেন!'

'আমি কী করতে এসেছি সে প্রশ্ন পরে। কিন্তু আপনি আগে আপনার পরিচয়টা খুলে বলুন তো।' ধারালো গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্কর, 'কে আপনি? আমি এখানে কী কাজে এসেছি, কোথায় উঠেছি, সেসব তথ্য এই গোটা দেশে গোনাগুনতি জনা দশেক লোক ছাড়া আর কারও জানার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি জানলেন কী করে?'

'কী করে জানলাম?' মৃদু হাসলেন মানুষটি, 'ধরে নিন যে দশজনের উল্লেখ আপনি করলেন, তাঁদের মধ্যেই একজন আমার অতি ঘনিষ্ঠ লোক। তিনি আমার শিষ্যস্থানীয়, আমাকে তিনি নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করেন। দেশের নিরাপত্তা জড়িত আছে এমন অনেক বিষয়েই আমার সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। সেই মানুষটিই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এখানে আসতে। আর... একটা অন্য কারণও আছে।'

উদভ্রান্তের মতো দু'জনের দিকে তাকায় দেবু। কোন দশজন লোকের কথা হচ্ছে এখানে? এখানে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই বা উঠছে কেন? মাথাটা ঘেঁটে যাচ্ছিল তার। যেন ওর মনের প্রশ্নটাই আঁচ করে নিলেন

কৃষ্ণদা। উঠে এসে সান্ত্বনার হাত রাখলেন দেবু'র পিঠে। তারপর বললেন, 'আমি দুঃখিত দেবাদিত্য। এবার বোধহয় তোমাদের সব কথা খুলে বলার সময় এসেছে।'

বোবা হয়ে থাকে দেবু। কৃষ্ণদা বলে চলেন।

'আমার এখানে আসা, বা তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া, কিছুই আকস্মিক নয়। যন্তরমন্তরে ঝড়জলের রাতের পর থেকেই ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি খবর রাখছিল, এই এলাকায় কারা আসছে আর যাচ্ছে।

ইনফ্যাক্ট তুমি আর তোমার বন্ধু এখানে আসছ, এই খবর পাওয়ার পরেই এই পরিকল্পনার ছক কাটা হয়। তারপরেই যোগাযোগ করা হয় প্রফেসর গাঙ্গুলির সঙ্গে। আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে।'

'কিন্তু... কিন্তু...' তুতলিয়ে যায় দেবু, 'এর কারণ কী? এ-সব... এসব সিক্রেট মিশন, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি! ঠিক কী ঘটছে এখানে?'

'আমরা যা ভাবছি তা যদি সত্যি হয় দেবাদিত্য,' গম্ভীর স্বরে বলেন কেষ্টদা, 'এখানে যা ঘটছে সেটা খুব সম্ভবত আজ অবধি আমাদের জানাশোনার পরিধির মধ্যে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। এ একদিকে যেমন অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক, অন্যদিকে মানুষের প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রমাণও বটে।'

'কিন্তু আপনি এতসব জানলেন কী করে?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলেন শঙ্কর, 'আর আপনাকে কে বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে?'

'বললাম তো, ধরে নিন এই দেশের সবচেয়ে শক্তিমান দশজন মানুষের একজন।' স্মিত হেসে বলেন কেষ্টদা।

'তিনি যেই হোন, তাঁর প্রফেশনাল এথিক্সের বাইরে গিয়ে আপনাকে এই কাজে নিয়োগ করবেন এটা আমি ভাবতে পারছি না। আর সেই জন্যই আপনাকে বিশ্বাস করাটাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।' চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন শঙ্কর, 'আপনি যে কোনো বিদেশি শক্তির এজেন্ট নন, তারই বা প্রমাণ কী?'

শান্ত হেসে শঙ্করের দিকে একবার তাকালেন কৃষ্ণদা। তারপর পকেট থেকে একটা আদ্যিকালের মোবাইল বার করে কাকে যেন কল করলেন। ওদিক থেকে সাড়া পেতেই ধীরস্থির স্বরে বললেন 'চিফ, ডক্টর গাঙ্গুলি আমার পরিচয় চাইছেন।'

যন্ত্রটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন শঙ্কর গাঙ্গুলির দিকে।

উত্তরোত্তর বিস্মিত হয়ে উঠছিল দেবু। সেই মালবাজারে মধ্যাহ্নভোজের সময় থেকে লোকটাকে দেখছে সে। তখন লোকটার হাবভাবে যে নিরীহ ছাপোষা বাঙালিমার্কা ছাপ ছিল, এখন তা ভোজবাজির মতোই উধাও। লোকটার স্বরে এখন এক আশ্চর্য সজীব ও স্থিরবুদ্ধি কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা খেলে বেড়াচ্ছিল।

মোবাইলটা নিয়ে দ্রুত ঘরের বাইরে গেলেন শঙ্কর গাঙ্গুলি। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এলেন তিনি। তাঁকে একইসঙ্গে নিশ্চিন্ত আর উত্তেজিত লাগছিল। যন্ত্রটা ফেরত দিয়ে তিনি বললেন 'ইওর আইডেন্টিটি ইজ প্রূভেন স্যার। এবার বলুন তো, এ ব্যাপারে আপনি কী করে জড়িয়ে পড়লেন? তার আগে আপনার পুরো পরিচয়টা দেবেন প্লিজ?'

মৃদু হাসলেন মধ্যবয়সি ভদ্রলোকটি। তারপর বললেন, 'স্যার সম্বোধনটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল প্রফেসর গাঙ্গুলি। আমার নাম কৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ মৈত্র।' বলে একটু থামলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, 'অবশ্য পুজো-আচ্চা বা আগমপন্থী তন্ত্রসাধনা করি বলে লোকে অন্য একটা উপাধিও দিয়েছে আমাকে, আগমবাগীশ।

আমার নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।'

*

'এই সাংঘাতিক এক্সপেরিমেন্ট করতে রাজি হলে কেন মামা?'

'লোভ রে সুজন, লোভ। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যাওয়ার লোভ। লোভে পাপ। পাপে...'

'আমরা কোথায় আছি মামা? আমরা কি মরে গেছি? এটা কি মৃতদের জগত?'

'বলা মুশকিল। চেনাজানা কোনো জগৎ নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে ওই যে বললাম, তোর বাবার থিওরি যদি সত্যি হয় তো...'

'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন মামা? তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?'

'না। শুধু ইচ্ছেশক্তির সাহায্যে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি। ইচ্ছেশক্তির বলেই বুঝেছিলাম, তুই এসেছিস এখানে। প্রতিটি মানুষের চিন্তাতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা হয়।'

'ইজ ইট টেলিপ্যাথি?'

'কী করে বলি বল তো? সারা জীবন বিশ্বাস করে এলাম যে এসব টেলিপ্যাথি-ট্যাথি সব ভাঁওতা... এখন তাই দিয়ে নিজের অবস্থান কীভাবে ব্যাখ্যা করি?'

'বাকিরা কোথায় মামা? তোমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন?'

'অনেক চেষ্টা করেছি, কারও সাড়া পাইনি। চল তো, একবার একসঙ্গে চেষ্টা করে দেখি। যৌথ প্রচেষ্টায় যদি কোনো ফল হয়।'

দু'জনে ধ্যানস্থ হন। অন্ধকার সমুদ্রে যেন অতি সূক্ষ্ম, অতি মৃদু কম্পন ওঠে। একটু পরে অতি ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়, 'হ্যালো, কেউ আছেন?'

সাড়া দেন হিতেশরঞ্জন, 'কে? মেজর মাত্রে?'

'ইয়েস!' সেই অনন্ত অন্ধকার সমুদ্র থেকে জবাব ভেসে আসে, 'আমরা কোথায় প্রফেসর?'

'আই অ্যাম ট্রাইং টু ফিগার দ্যাট আউট।'

'হোয়াই ক্যান্ট আই ফিল মাই বডি পার্টস?'

'মনের জোর একত্রিত করুন মেজর, নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন। এখানে যোগাযোগ করার বা নিজের অস্তিত্ব অনুভব করার ওটাই একমাত্র উপায়।'

'ওকে। বাট দিস ইজ এক্সট্রিমলি স্কেয়ারি, আই মাস্ট সে।'

'প্যানিকড হবেন না মেজর। এখন আমরা একটা ঘোর বিপদের মধ্যে আছি। এখান থেকে উদ্ধার পেতে গেলে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। বিচলিত বা আতঙ্কিত হলেই আমাদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। মনের জোর, ইচ্ছাশক্তি, এছাড়া আমাদের কাছে এইমুহূর্তে আর কোনো অস্ত্র নেই এই সিচুয়েশন থেকে বেরোবার।'

'কিন্তু সিচুয়েশনটা কী সেটাই তো বুঝতে পারছি না! আমাদের টিমের বাকিরা কোথায়?'

'আমার ভাগ্নে পাকেচক্রে এসে পড়েছে এখানে, তার সাড়া পেয়েছি। বাকিদের খুঁজে বের করার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনি মনের শক্তি একত্রিত করে তাদের ডাকুন। যত বেশি মানুষ চেষ্টা করবে, ওদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।'

'কিন্তু... আমরা আসলে কোথায়?'

'আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে যে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি, কিন্তু অন্য ডাইমেনশনে। মানে স্পেস অ্যান্ড টাইমের অন্য মাত্রায়।'

'হোয়াট?!'

*

পরের দিন যখন ওরা যন্তরমন্তরে পৌঁছল তখন প্রায় দুপুর। সারা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চাপা উত্তেজনার আঁচ লাগছিল তিনজনের গায়েই। পুলিশের নিত্য টহল চলছে। প্রতিটি বাজারে বা মোড়ে

কৌতূহলী মানুষের ভিড়।

নিরাপত্তার পুরু চাদরে মোড়া ল্যাবে ঢুকতে ওঁদের তিনদফা বায়োমেট্রিক টেস্টের ধাপ পেরোতে হল। সে নিয়ে চাপা স্বরে গজগজ করলেন শঙ্কর।

সিকিউরিটিকে বলে তক্ষুনি যন্তরমন্তরের মেশিনঘর খোলানো হল। ঘটঘট করে যখন মেশিনঘরের দরজা ওপরে উঠে যাচ্ছে, নিজের অজান্তেই সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল দেবু'র।

কাল সকাল থেকে দুশ্চিন্তার ঠেলায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার। সুজনকে সে নিজের থেকে কম ভালোবাসে না। সুজনের মা, মানে কাকিমাও খুব স্নেহ করেন তাকে। অথচ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হতে চলল, ছেলেটার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, রহস্যটা ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার কাছে।

দরজাটা পুরো খুলে যেতে তিনজনেই হাঁ করে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে।

মেশিনটা একটা প্রায় দেড়তলা বাড়ির সমান উঁচু। দুটো লরি পাশাপাশি রাখলে যতটা চওড়া হয় ততটাই চওড়া। প্রস্থও প্রায় ওই দুই লরির সাইজেরই, উঁকি দিয়ে দেখল দেবু।

দুজনে ভেতরে ঢুকল। কেষ্টদা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন, 'আমি এসব বুঝবো না ভাই।'

শঙ্কর গাঙ্গুলি মেশিনের গায়ে নাট-বোল্ট দিয়ে সেঁটে রাখা লেবেলটা কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। স্বগতোক্তি করলেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড এক্সট্রিমলি বিউটিফুল।' তারপর পুরো মেশিনটা ঘুরে দেখলেন। তারপর অন্যদের দিকে ঘুরে বললেন, 'এর কন্ট্রোলরুম বাড়ির দোতলায়। ওখানেই সব রিডিং পাওয়া যাবে। মেজর, এইবার এটা বন্ধ করে আমাদের ওখানে নিয়ে চলুন।'

দোতলায় কন্ট্রোলরুমের পাল্লা খুলতেই একটা বদ্ধ ভ্যাপসা গন্ধ সবার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনজনেই মুখে রুমাল চাপা দিলেন। শুধু মেজর বক্সি, যিনি সদ্য এই ফেসিলিটির সিকিউরিটির দায়িত্ব নিয়েছেন, নিবাত নিষ্কম্প ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গন্ধের ধাক্কা সামলে উঠে দেবু বুঝল, এই ঘরের প্রতিটি বর্গইঞ্চি অত্যাধুনিক যন্ত্রে ঠাসা। এদের মধ্যে বেশ কিছু যন্ত্রের বিবরণ শুধু বিভিন্ন জার্নালেই পড়েছে সে। চোখের সামনে সেসব দেখে তার গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল।

ঘরের একটা দিকের দেওয়াল পুরোটাই পুরু বুলেটপ্রুফ কাচের তৈরি। তার সামনে দাঁড়ালে মেশিনঘরের দরজাটা চোখে পড়ে। কাচের দেওয়ালের ঠিক সামনে বড় কন্ট্রোল প্যানেল। প্রথমে সেটাই মন দিয়ে দেখলেন শঙ্কর। তারপর প্রতিটা যন্ত্র দেখতে দেখতে কন্ট্রোল প্যানেলের পাশে রাখা ল্যাপটপের সামনে এলেন।

ল্যাপটপ খোলাই ছিল, যদিও হাইবারনেশনে। পাওয়ার বাটন অন করার সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাপটপের স্ক্রিন লাফিয়ে উঠল ওঁদের সামনে। ফাঁকা বাক্সের মতো জায়গার ওপরে জ্বলজ্বল করে ওঠে দুটি শব্দ, 'পাসওয়ার্ড প্লিজ।'

হঠাৎ থমকে গেলেন শঙ্কর। ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠলেন, 'এ কী! এটা এখানে কেন?'

জিনিসটা নজরে পড়েছে দেবাদিত্যরও। সেও আশ্চর্য হল ওটাকে দেখে। জিনিসটা আর কিছুই না, একটা বালিঘড়ি।

'বলতে পারব না প্রফেসর।' এতক্ষণ পর প্রথম কথা বলেন মেজর বক্সি, 'এ-ঘরের সবকিছু প্রফেসর বাসুর তত্ত্বাবধানে ছিল। কয়েকজন সহকারী তাঁকে সাহায্য করতেন। সেইদিনের পর থেকে তাঁদেরও কোনো খোঁজ নেই।

আমরা কোনো ঝুঁকি নিইনি, ঘরটা সিল করে রেখেছিলাম। কোনো কিছুতে হাত দিইনি। প্রতিটি যন্ত্র যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবেই রাখা আছে। সেদিনের পর আপনারাই প্রথম এই ঘরে ঢুকলেন।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়তে-নাড়তে বিড়বিড় করেন শঙ্কর, 'এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তাতে কোনো পাওয়ার আউটেজ ঘটেনি? প্রতিটা যন্ত্র ঠিকঠাক রিডিং দিচ্ছে? কোনো মেজারমেন্ট ইক্যুইপমেন্টের কোনো ক্ষতিই হয়নি? স্ট্রেঞ্জ! যদি ল্যাপটপের পাসওয়ার্ডটা...'

হঠাৎ নীচু হয়ে কী যেন একটা হাতে তুলে নেন তিনি। দেবু চিনতে পারে জিনিসটাকে। যে কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রতিটি খুঁটিনাটি লিখে রাখা হয় যাতে, সেই ল্যাবের লগবুকটা পড়ে ছিল নীচে। দ্রুত লগবুকের পাতা উলটে একটা পাতায় এসে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন শঙ্কর, 'এই তো! পেয়েছি!'

দ্রুত অন্যদের দিকে ঘুরে উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন তিনি, 'আপনারা আমাকে একটু একলা ছেড়ে দিন প্লিজ। আপনারা একটু এদিক-ওদিক জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখুন কোথায় কোনো ক্লু পান কি না। আমি বরং কন্ট্রোল প্যানেল অ্যাক্সেস করে বোঝার চেষ্টা করি, কী হয়েছিল সেদিন। এই রহস্যের সমাধান করতে গেলে আমাকে এই এক্সপেরিমেন্টের প্রতিটি স্টেপের ডেটাসেট চেক করতে হবে।'

ল্যাপটপের সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে কিবোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়েন বর্ষীয়ান পদার্থবিদ।

*

এক মৃদু অপার্থিব আলোর মধ্যে শূন্যে ভেসেছিলেন কয়েকজন। তাঁদের অনেককে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আবার অনেককে দেখা যাচ্ছিল না। কেমন যেন কম্পমান অবস্থায় ছিলেন তাঁরা। টিভির স্ক্রিন খারাপ হলে যেরকম দেখায়, সেরকম। চারদিকে শূন্যতা। তার কোনো আকার বা অবয়ব নেই। লোকগুলো শূন্যে ভেসে আছে বলাও ভুল। যেন কতগুলো চলমান অস্তিত্ব এই আদিম অতিলৌকিক আলোর মধ্যে গেঁথে আছেন। এই স্থানটির সামনে, পেছনে, উপর, নীচ, আকাশ, ভূমি কিছুই নেই।

'এখন তাহলে আমাদের কী করণীয়, প্রফেসর বোস?' বেশ কিছুক্ষণ পরে চিন্তাতরঙ্গ শোনা যায় একজনের, 'কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, তার কিছুই বুঝতে পারছি না যে আমরা। আপনি কিছু বলুন প্লিজ।'

কথাটা যিনি বললেন, তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। শীতে, ভয়ে বা আতঙ্কের নয় এ কম্পন। বয়ে আসা বাতাসে প্রদীপের শিখা যেমন সরে যায়, তেমনই কেঁপে উঠলেন তিনি, যেন ছবিটা আবছা হয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফের।

'কোথায় আছি, সেটা বোধহয় বুঝতে পারছি লেফটেন্যান্ট সাওয়ন্ত। এমনকি এখানে যে কী ঘটেছে সেটা অনুমানও করতে পারি। কিন্তু...'

'কিন্তু কী, প্রফেসর?' শান্ত কণ্ঠে কে যেন জানতে চায়।

'এখান থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব মেজর মাত্রে।'

'অসম্ভব! মানে? আমরা কি এখানে থেকে থেকে মরে পচে ভূত হয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি নাকি?' উষ্মা ফুটে ওঠে আরেকজনের তেজি গলায়।

'মরে ভূত? না, তা অবশ্য হবেন না।' ক্লান্ত হেসে জবাব দেন প্রফেসর, 'এখানে মরার কোনো প্রশ্নই নেই।'

'হোয়াই?' প্রশ্ন আসে।

'কারণ আমরা এখন আর মরজগতে নেই।'

'এ আপনি কী বলছেন প্রফেসর?' উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায় আরেকপ্রান্ত থেকে, 'মরজগতে নেই মানে? আমরা এই পৃথিবীতে আছি না নেই?'

'আমার অনুমান যদি সঠিক হয়, তবে জেনে রাখুন, আমরা স্থানিক ভাবে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। কিন্তু সময়ের অন্য মাত্রায়।'

'সময়ের অন্য মাত্রা মানে?' উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করেন আরেকজন, 'এসব আবার কীরকম হেঁয়ালি?'

'যথাসম্ভব সরল করে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। মন দিয়ে শুনুন।

আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটি করছিলাম সেটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং জটিল একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। সম্ভবত ভারতবর্ষের মাটিতে হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছিল এটি।

আপনারা অনেকেই জানেন যে সার্ন বলে একটি ইউরোপীয় সংস্থা গত দেড় দশক ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টটি চালাচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার উদ্দেশ্য অনেক মহাজাগতিক রহস্য উন্মোচন করা। আরও ভালো করে বলতে গেলে সৃষ্টির গোড়ার কথাগুলি জানা।

সেই কাজেরই একটি খুব ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। যে ল্যাবরেটরিতে কাজটা করার কথা, সেটাও এই উদ্দেশ্যেই প্রায় যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তৈরি করা হয়।

এই পরীক্ষার ফলাফল জাতীয় সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বিষয় হতে পারে বলে স্থানীয় বা রাজ্য পর্যায়ের কাউকেই বিশদে কিছু জানানো হয়নি, শুধু বলা হয়েছিল এর জন্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে।'

'কাজটা আসলে কী, প্রফেসর?' মেজর মাত্রের শান্ত স্বর সবার কাছে এসে পৌঁছয় আবার।

'আমি থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার সুপারসিমেট্রি।

ফিজিক্সের নিয়ম বলে, যেসব মৌলিকতম উপাদান দিয়ে এই বস্তুজগৎ তৈরি, তার ঠিক উলটো চরিত্রের মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরিও আরেকটি বস্তুজগৎ আছে। যেমন ধরুন আমাদের চেনাজানা জগতের সবকিছুর মৌলিক একক হল অ্যাটম বা পরমাণু। এই অ্যাটম বা পরমাণু যে মৌলিক কণা দিয়ে তৈরি, তার মধ্যে একটি হল ইলেকট্রন, এ নেগেটিভ চার্জ বহন করে। এই উলটো চরিত্রের বস্তুগুলোর যে পরমাণু, তার ইলেকট্রন পজিটিভ চার্জ বহন করে, তখন তাকে বলে পজিট্রন।

এই উল্টো চরিত্রের বস্তুগুলিকে বলে অ্যান্টিম্যাটার। আমার কাজ এই অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে।

অ্যান্টিম্যাটারের সবচেয়ে অদ্ভুত দিক হচ্ছে যে একবার যদি এ ম্যাটারের সংস্পর্শে আসে তো একে অপরের স্পর্শমাত্রে এরা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। মানে বস্তুর আর কিছুই পড়ে থাকে না, পুরোটাই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

সেই শক্তির পরিমাণ, আইনস্টাইনের বিখ্যাত ই ইকোয়ালস টু এম সি স্কোয়্যার অনুযায়ী, বিপুল এবং অভাবনীয়। এক কিলো অ্যান্টিম্যাটার আর এক কিলো ম্যাটার সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হলে যে পরিমাণ শক্তির উৎপত্তি হবে তা নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত পরমাণু বোমার প্রায় আঠেরো হাজার গুণ!'

সবাই নীরব রইলেন বলে একটু থেমে প্রফেসর বসুই ফের কথা বলতে শুরু করেন।

'যে যন্ত্রটি নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম, তার নাম সাইলেক্ট্রোপ্রোটন। শুধুমাত্র এই এক্সপেরিমেন্টটির জন্যেই যন্ত্রটি তৈরি করা, এর আর কোনো জুড়ি নেই।

এই সাইলেক্ট্রোপ্রোটন যন্ত্রে আমি দেখতে চেয়েছিলাম, ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটারের মিলনে বিস্ফোরণের প্রসেসটা কন্ট্রোল করা যায় কি না। সেক্ষেত্রে ফিজিক্সের অনেকগুলো অন্ধকার দিক একসঙ্গে আলোকিত হত। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান এনার্জি সমস্যারও সমাধান হত। কয়লা বা খনিজ তেলের ওপর কাউকে ভরসা করে থাকতে হত না। বিশাল তাপ বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরকার হত না। ছোট-ছোট ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন শক্তির জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা যেত।'

শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেন মেজর মাত্রে, 'গোলমালটা কোথায় হল প্রফেসর?'

'সম্ভবত আমাদের ক্যালিব্রেশনে কিছু ভুল ছিল। বিস্ফোরণের প্রসেসটা স্লো করতে পেরেছিলাম, কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারিনি।

যে পরিমাণ এনার্জি ওই ছোট পরিসরে তৈরি করেছিলাম, সেটা একইসঙ্গে স্লো আর আনকন্ট্রোল্ড হওয়ার জন্যে একটা অ্যাসিমিট্রিক স্পেসটাইম কার্ভ তৈরি হয়ে যায়। আমরা প্রসেসটাকে আরও কন্ট্রোল করতে গিয়েই সর্বনাশটা করেছি। স্পেসটাইমে একটা ফিসার তৈরি করে ফেলেছি।'

'মানে?' প্রশ্ন করেন একজন।

'মানেটা বোঝানো একটু মুশকিল। একটা বিপুল বিস্ফোরণের শক্তি একটা অত্যন্ত ছোট টাইম অ্যান্ড স্পেসে আটকে পড়েছিল। সেই শক্তি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি বটে, কিন্তু সময় আর স্থানের ফেব্রিকটাকে সাময়িকভাবে ছিঁড়ে ফেলেছিল।

সময়কে যদি একটা বহমান পাথুরে স্রোত বলে ধরে নেন, তার গায়ে কিছুক্ষণের জন্য একটা গহ্বর তৈরি হয়ে গেছিল। সেটাই অন্য একটা ডাইমেনশনের সঙ্গে আমাদের চির চেনা স্পেসটাইমের মধ্যে একটা যাতায়াতের পথ খুলে দিয়েছে। সেই পথেই আমরা সদলবলে এই ডাইমেনশনে এসে পড়েছি।'

'কিন্তু প্রফেসর,' এতক্ষণ শান্ত থাকা গলায় একটা উদ্বেগের ভাব প্রকট হয়, 'শুধু কি আমরাই এখানে আছি?'

'সেই তো মুশকিল।' অসহায় আক্ষেপের স্বর শোনা যায় প্রফেসর বাসু'র দিক থেকে, 'সময়ের গহ্বরটা এখনও জীবন্ত। মাঝে-মাঝেই সে সক্রিয় হয়ে উঠছে। কেন হচ্ছে সেটা আমি জানি না, এরকম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাঝেমধ্যেই টের পাই যে সময়ের সেই ক্ষুধাগহ্বর নতুন শিকার ধরে এনেছে।'

'তার মানে... রিসেন্টলি এই লাল ঝামেলা বস্তি, চেংমারি টি গার্ডেন---এ-সব জায়গা থেকে যারা হারিয়ে যাচ্ছে, তারাও কী...?'

'হ্যাঁ সুজন, তারাও এই খপ্পরেই পড়েছে। তারাও আমাদের মতোই সময়ের গর্ভে আপাতত বন্দি। আমি... আমি সত্যিই জানি না এর থেকে মুক্তির কী উপায়।'

'এ আপনি কী বলছেন প্রফেসর?' 'আমাদের এখানে কতদিন থাকতে হবে?'

অনেকগুলো আর্তস্বরের তরঙ্গ অন্ধভাবে সবার ওপর আছড়ে পড়ে। এতক্ষণ চেপে রাখা আতঙ্ক যেন পাগলের মতো বেরোতে চায় একটা রন্ধ্রপথে। এরই মধ্যে শান্ত স্বর শোনা যায় সুজনের, 'কিন্তু মামা, তুমি এতক্ষণ যা-যা বললে, সেখান থেকেই কী একটা উপায় বের হতে পারে না?'

'কী উপায়, সুজন?'

'কেউ একজন যদি সেই যন্ত্রটাকে ফের চালিয়ে দুর্ঘটনার অবস্থায় নিয়ে যায়, তবে কি স্পেসটাইমে আবার ফিসার তৈরি হয়ে আমাদের ফেরত যাওয়ার পথ খুলে যেতে পারে না?'

'সেটা যে আমার মাথাতেও আসেনি, তা নয় রে। কিন্তু কার্যত সেটা অসম্ভব।'

'কেন? অসম্ভব কেন প্রফেসর?'

'প্রথমত, এখানে ঠিক কী হয়েছে সেটা না জানলে, আমাদের উদ্ধার করার এই উপায়টা বাইরের কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। একমাত্র অত্যন্ত প্রতিভাবান কোনো পার্টিকল ফিজিসিস্ট, যিনি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনি বুঝলেও বুঝতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি বোঝেও, তাহলে শুধুমাত্র মেশিনের পাস্ট ডেটাসেট দেখে সেইদিনের ক্যালিব্রেশনে মেশিনটাকে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষুরধার বুদ্ধির কোনো বৈজ্ঞানিক প্রায় নেই বললেই চলে।

তৃতীয় কারণটাই সবচেয়ে মোক্ষম। যে মুহূর্তে মেশিন সেইদিনের অবস্থায় অপারেট করা শুরু করবে, সেই মুহূর্তে একটা গাইড পাথ তৈরি হবে।'

'সেটা কী জিনিস প্রফেসর?'

'ধরে নিন, সময়ের সরণি। আমাদের চেনাজানা জগতে ফিরে যাওয়ার ওটাই পথ। আমাদের একে-একে সেই পথ ধরে এই ডাইমেনশন থেকে বেরিয়ে আমাদের ডাইমেনশনে পৌঁছতে হবে।

মুশকিল হল, কোয়ান্টাম প্রোবাবিলিটি অনুসারে সেই গাইড পাথের দিকনির্দেশ ক্ষণে-ক্ষণে বদলাতে থাকে। তখন প্রতি মুহূর্তে জটিল ইকোয়েশন সলভ করতে হবে নতুন দিক খুঁজে বার করার জন্য, আর সেটা পুরোটাই করতে হবে মনে-মনে। সেই জিনিস পারেন, এমন অবিশ্বাস্য প্রতিভাবান অঙ্কশাস্ত্রবিদ আমাদের মধ্যে একজনও নেই। তাছাড়া...'

'তাছাড়া কী মামা?' অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে সুজন।

'আমাদের সবাইকে সময়ের ওপারে যেতে যতক্ষণ সময় লাগবে ততক্ষণ এই গাইড পাথ দু'প্রান্তেই খোলা থাকতে হবে। ওদিকে না হয় সে ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু এই প্রান্ত খোলা রাখার একটাই উপায়---আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি! সময়ের পথ ধরে একেকজন যেই বেরিয়ে যেতে থাকবেন, তখন আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তির পরিমাণ কমতে থাকবে, ফলে সেই পথ ধরে ওপারে যাওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকবে এক্সপোনেনশিয়াল রেটে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ যে লোকটি সবার শেষে থাকবেন, তাঁর এখানেই আটকা পড়ে থাকার সম্ভাবনা প্রায় একশো শতাংশ। এত বড় আত্মত্যাগ আমাদের মধ্যে কে করবেন? কে হবেন সেই শেষ ব্যক্তি?'

আরও নিবিড়, নিকষ অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে এল সেই আলোক শিখাগুলোর চারপাশে।

*

'আপনার কথা যদি সব মেনেও নিই কৃষ্ণদা, কয়েকটা খটকা কিন্তু আমার মন থেকে এখনও যাচ্ছে না।'

'সেগুলো কী দেবাদিত্য?'

দু'জনে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। পথে অনেকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন দু'জনে। কিন্তু কেউ মুখই খুলতে চায় না। পুরো এলাকাটার ওপর কে যেন একটা বোবা আতঙ্কের চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

ডায়নার উজানে একটা শ্মশানঘাট আছে। এদিকের মদেশিয়া কুলিকামিনরা ওখানেই মৃতদেহ দাহ করে। ছাই ভাসিয়ে দেয় ডায়না নদীর জলে।

শ্মশানের কাছেই একটা পোড়ো ছাউনির নীচে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল দু'জনে। অনেক দূরে দু'একটা লোক জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে ফিরছে। এখান থেকে আরেকটু গেলেই বাস রাস্তা। সেখান থেকে বাস আর ট্রেকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। পড়ন্ত দুপুরের নরম রোদ শান্ত ভাবে বিছিয়ে ছিল ঘাসে, জলে, বনচ্ছায়ায়।

'আপনি তো তন্ত্রমন্ত্র, পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকা লোক। তাহলে, গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা---এ-সবের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীসের? তার ওপর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর নাকি আপনার পরামর্শ নিয়ে থাকেন? এটা হজম করা একটু অসুবিধাজনক নয় কি? মানে অমন হাই প্রোফাইল লোক আপনার মতো পুজো-আচ্চা করা লোকের সাহায্য নেবেন কেন?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন সেই মধ্যবয়সি পুরুষটি। দূরের পাহাড়ের দিকে একবার তাকালেন তিনি। ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছিল নদীর দিক থেকে। সেদিকে মুখ করে বলতে শুরু করলেন, 'ঠিক ধরেছ। এই খটকাটা দূর করা আমার কর্তব্য তো বটেই, কারণ এর সঙ্গে আরও একটা ছোট, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গল্প লুকিয়ে আছে, প্রায় হাজার বছরের পুরোনো গল্প।'

নড়েচড়ে বসল দেবু।

'স্কুলে নিশ্চয়ই পড়েছো তিব্বতের ব্যাপারে। হিমালয়ের কোলে চমরী গাই, বৌদ্ধ মঠ, মানস সরোবর আর কৈলাস পর্বত নিয়ে পাহাড়ঘেরা দেশ তিব্বত। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণে ভারতের সঙ্গে

তিব্বতের সম্পর্ক অনেক পুরোনো। তিব্বতের প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বজ্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম।

তিব্বতে এই ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ অনেক জটিল ইতিহাসের বিষয়। সে নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনায় যাব না। শুধু বলে রাখি, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে এই বাংলার হাত ধরেই। আচার্য শান্তরক্ষিত থেকে শুরু করে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অনেক মহান ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে জীবনপাত করেছেন।

আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে ভারতবর্ষে বৈদেশিক শক্তি হিসেবে ইসলামের আক্রমণ ঘটে। সেই অত্যাচার, খুনজখম আর লুটতরাজ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে প্রায় শেষ করে দেয়। নালন্দার মতো বিশ্ববন্দিত শিক্ষালয় নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়। শত-শত বৌদ্ধ ভিক্ষু নিহত হন, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা ধর্ষিতা হন।

যে কয়জন বৌদ্ধপণ্ডিত বেঁচে ছিলেন তাঁরা তাঁদের পুঁথিপত্র, বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি নিয়ে নেপাল, কামরূপ, তিব্বত এসব যায়গায় পালিয়ে যান। সেই জন্যই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে মুছে গেলেও আজও তিব্বতের অনেক মঠে তিব্বতিতে অনুবাদ করা ভারতীয় পুঁথি পাওয়া যায়।

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, উনিশশো পঞ্চাশ সাল নাগাদ চিন অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তিব্বত দখল করে। এই নিয়ে অনেক প্রতিবাদ আন্দোলন ইত্যাদির পরে তিব্বতি জনগণের সঙ্গে চিনের একটা কাজ চালানো গোছের স্বশাসনের চুক্তি হয়। তবে চিনের সরকার তা মানতে চাননি।

ফলে চিনের তিব্বত দখলের ন'বছরের মধ্যেই তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা ভারতে পালিয়ে আসেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে দলাই লামার ভারতে পালিয়ে আসার পেছনে ভারতের তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থা আইবি'র একটা বড় ভূমিকা ছিল।

দলাই লামা যখন ভারতে চলে আসেন তখন তাঁর অনুগামীরা অনেক প্রাচীন ও গোপন পুঁথিপত্র তাঁদের সঙ্গে ভারতে নিয়ে আসেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন, নাম লোবসাং গিয়াৎসো, দলাই লামার অগোচরে একটি অতি প্রাচীন পুঁথি আইবি'র তৎকালীন প্রধান বি এন মল্লিকের হাতে তুলে দেন।

পরের দিন সেই হতভাগ্য লামার ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া যায় পানিপথের রাস্তায়।'

এতটা বলে থামলেন কৃষ্ণানন্দ। গা'টা শিরশির করে উঠছিল দেবুর।

'লোবসাং-এর সঙ্গে খুন হয়েছিলেন আই বি'র আরও একজন ধুরন্ধর অফিসার। ফলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পুরো ডিপার্টমেন্ট খুনিদের ধরতে লেগে পড়ে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও খুনিদের ধরা যায়নি। শুধু এটুকু জানা গেছিল যে ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আই বি আরও আঁচ করেছিল যে মূল ষড়যন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশি শক্তিরও যোগাযোগ আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তোলপাড় করে ফেলেও খুনিদের টিকিও ছোঁয়া যায়নি। যেন হাওয়ায় মিশে যায় তারা। এখনও আই বি'র সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত কেসগুলির মধ্যে এটি একটি।

বি এন মল্লিক, ওরফে ভোলানাথ মল্লিক ক্ষুরধার বুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি গুরুত্ব বুঝে পুঁথিটির গোপনীয়তা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেন।

দলাই লামা ভারতে চলে আসার তিন বছরের মধ্যে বাষট্টি সালে চিন ভারতকে আক্রমণ করে। তালেগোলে আইবি এই পুঁথিটির কথা প্রায় ভুলেই যায়। চৌষট্টি সালে ভোলানাথ মল্লিক রিটায়ার করেন। অন্য সবকিছুর সঙ্গে এই গোপন পুঁথিটির উত্তরাধিকার অর্শায় পরের আইবি ডিরেক্টর এস পি ভার্মার ওপর। আর তার সঙ্গে মল্লিকসাহেব দিয়ে যান নিজের লেখা একটি সিল করা ডায়েরি।

ভারত-চিন যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে ভারত সরকার আটষট্টি সাল নাগাদ বিদেশি শক্তিগুলির ওপর নজরদারি চালাবার জন্য একটি নতুন গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করেন, নাম রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকাল উইং, সংক্ষেপে 'র'। এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আর এন কাও নামে এক প্রখর বুদ্ধিমান মানুষ আই বি'র ডেপুটি ডিরেক্টর

জেনারেল ছিলেন। তিনিই এই নবগঠিত সংস্থার দায়িত্ব নেন। আজ ওই সংস্থার যা সুনাম, তাতে কাও সাহেবের যথেষ্ট অবদান আছে।

আর এন কাও 'র'-র দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আইবি-র প্রধান এস পি ভার্মা পুঁথিটি ভোলানাথ মল্লিকের সীল করা ডায়েরিসহ সযত্নে কাওয়ের হাতে তুলে দেন।

এর পর আসে একাত্তরের যুদ্ধ, 'র' তখন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ব্যস্ত। ফলে এই পুঁথিটির ব্যাপারে আর কেউ বিশেষ কৌতূহল দেখায়নি। ধীরে-ধীরে পুঁথিটির কথা প্রায় ভুলেই যায় সবাই।

কিন্তু, একরকম হঠাৎ করেই ওটা আবার ফিরে আসে আলোচনায়।

ভোলানাথ মল্লিকের নাতির ছেলে হচ্ছে অভিরূপ মল্লিক। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়েস, শখের ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার। তার ওপর বইয়ের পোকা বললেই চলে। এই অভিরূপ মল্লিক একদিন হঠাৎ করেই তাদের বাড়ির লাইব্রেরির মধ্যে বি এন মল্লিকের লেখা অনেকগুলো ডায়েরি খুঁজে পায়।

ডায়েরিগুলো পড়ে সে ঠিক করে 'লাইফ অফ আ স্পাই' নামে বি এন মল্লিকের একটা জীবনী বার করবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে ডায়েরির সেটটা সম্পূর্ণ নয়। অনেক চেষ্টা করেও একটা বিশেষ বছরের ডায়েরি সে খুঁজে পায়নি। উনিশশো ষাট সালের ডায়েরি।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে বার করে যে ডায়েরিটা আই বি' বা র'য়ের গোপন লকারে আছে। ছাত্রজীবনে রাজনীতি করার সুবাদে তার কিছু রাজনৈতিক কানেকশন ছিল। তার মাধ্যমে সে এই দুই সংস্থার দ্বারস্থ হয়। আর তখনই ডায়েরিটা আনিয়ে খুলে পড়েন 'র'-এর বর্তমান প্রধান।

ডায়েরিটা পুরোটাই ইংরেজিতে লেখা। সাধারণ রোজনামচা, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। শুধুমাত্র শেষ চার পাতাতে একটা পুঁথির উল্লেখ আছে, যেটা এই ডায়েরিকে একটা আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। এই শেষ ক'টা পাতায় উনি লিখেছেন, দৈবাৎ এমন একটা পুঁথি তাঁর হাতে এসে পড়েছে, যা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রায় অমূল্য। সেই পুঁথি এমন একজনের লেখা, যাঁকে তিব্বতে বা নেপালে দ্বিতীয় বুদ্ধের মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে শুধু এজন্য নয়। পুঁথিটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

ভোলানাথ লিখেছেন, এক তিব্বতি ভাষার গবেষককে দিয়ে পুঁথিটির অনুবাদ করানো হয়। তাতেই জানা যায় যে পুঁথিতে যা লেখা আছে তা যথেষ্ট অদ্ভুত, রহস্যময়, এবং বিপজ্জনক। সেইজন্যই সেই খুন হয়ে যাওয়া লামা পুঁথিটি তিব্বতের বাইরে নিয়ে এসেও নিজের কাছে রাখা নিরাপদ বোধ করেননি। তিনি ওটা ওইজন্যই আইবি-র হাতে তুলে দিয়েছিলেন।'

এই বলে ফের থামলেন কৃষ্ণানন্দ। নির্মেঘ আকাশ জুড়ে নেমে আসছে শান্ত বিকেল, নম্র সন্ধ্যা। আকাশ জুড়ে পাখিদের ঝাঁক, তারা ফিরে যাচ্ছে নিজেদের বাসায়। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই সুজনের জন্য বুকটা হু-হু করে উঠলো দেবু'র। কে জানে ছেলেটা কী অবস্থায় আছে। কবে ফিরবে, বা আদৌ ফিরবে কি না! আর... ও যদি না ফেরে? তাহলে কাকিমার সামনে কীভাবে দাঁড়াবে দেবাদিত্য?

কৃষ্ণানন্দের কথায় সংবিৎ ফেরে তার। তিনি তখন ফের বলতে শুরু করেছেন।

'আগেই বলেছি, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত একজন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি কী করে এত ঘনিষ্ঠ হলেন, কেন তিনি জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আমার পরামর্শ নেন সেসব বলার সময় এটা নয়। শুধু জেনে রাখো, তাঁর জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম। তিনি সেই পুঁথিটি পড়েন, এবং তৎক্ষনাৎ তার গুরুত্ব বুঝতে পেরে আমাকে পুঁথিটি পড়ে দেখতে বলেন।'

'সেই পুঁথিতে কী লেখা আছে কৃষ্ণদা?' দেবু'র গলাটা কেঁপে ওঠে, 'এখানে যা ঘটছে তার সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কী?'

'সেই পুঁথিতে একজন বৌদ্ধ সাধক এক অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।' কৃষ্ণানন্দের চোখদুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করছিল, 'তিনি সম্ভবত এই উপমহাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্রবিদ। তাঁর

অলৌকিক বিভূতি এখনও বহু কল্পকথার উপজীব্য বিষয়, তাঁর জীবনকাহিনিও অত্যন্ত রহস্যাবৃত এবং অতি আশ্চর্যজনক। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে সেই মানুষটির ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। শুধু বৌদ্ধ সাধকদের কাছে নয়, ইতিহাসবিদদের কাছেও তিনি একজন অসাধারণ, অসামান্য, অতিলৌকিক পুরুষ।'

'কে তিনি?' কৌতূহলী হয়ে পড়ে দেবু।

'আচার্য পদ্মসম্ভব।'

দেবুর হঠাৎ শীত করে উঠল। পাহাড়ের দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিচ্ছিল কৃষ্ণানন্দের পোশাক। সেই হাওয়া খানিক গায়ে মেখে ফের বলতে থাকেন তিনি।

'যদি ভোলানাথ মল্লিকের কথা সত্যি হয়, তাহলে খুব সম্ভবত পদ্মসম্ভবের নিজের হাতে লেখা একমাত্র পুঁথিটিই মল্লিকসাহেবের হস্তগত হয়েছিল। তাঁর স্বহস্তে লেখা পুঁথি পাওয়া মানে ঐতিহাসিকদের কাছে এক বিশাল ব্যাপার। টাকার অঙ্কে তার মূল্য নিরূপণ করা যায় না।

আচার্য পদ্মসম্ভব পুঁথিতে লিখেছেন, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে তিনি একটি অভাবনীয় তন্ত্রকর্ম সমাধা করেন। আমি নিজে তন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত, এ নিয়ে গবেষণাও কম করিনি। নিজের মুখে বলাটা ঠিক নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার থেকে বড়ো তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ এই দেশে আর কেউ নেই বললেই চলে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, উনি যা লিখেছেন, তার যদি কণামাত্র সত্যি হয়, তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আচার্য পদ্মসম্ভব দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ অবতার। নচেৎ সেই কর্ম সমাধা করা কোনো সাধারণ তন্ত্রবেত্তার পক্ষে অসম্ভব।'

'সেটা কী, কৃষ্ণদা?' নদী, আকাশ, পাহাড় জুড়ে নেমে আসা অন্ধকারে ভীত গলায় বলে ওঠে দেবাদিত্য। সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল সামান্য পৃথুল, খর্বকায় মানুষটির চোখ দু'খানি। কৃষ্ণানন্দ নীচু গলায় কথাগুলো বলে চলেন। দেবু'র মনে হয়, যেন শুধু সে নয়, এই পৃথিবী, এই সময় কান পেতে শুনছে এই অলৌকিক আখ্যান।

'আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে তিনি এই অঞ্চলেই একটি ছোট বিহারে অধ্যক্ষপদে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় তাঁর সামনে একটি ভয়াবহ অভিশপ্ত বস্তু এনে উপস্থিত করা হয়।

সেই অভিশপ্ত বস্তুটি কী, আর কীভাবেই বা সেটি তাঁর হাতে পৌঁছল, তার বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে পুঁথি নীরব। সেই মহান তন্ত্রবিদ শুধু এটুকু লিখেছেন যে সেই আভিচারিক বস্তুটির মতো মারণ ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে দেখেননি। তাকে নিবৃত্ত করা সেই অসামান্য শক্তিশালী তন্ত্রসাধকের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। ফলে, একরকম বাধ্য হয়ে তিনি একটি অতিলৌকিক কাজে ব্রতী হন।'

'কোন কাজ?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করে দেবু।

'তিনি স্বয়ং মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধ করে কালজঠর উন্মুক্ত করেন। উন্মোচিত করেন সময়ের দ্বার।'

কথাটা বোধগম্য হতে দেবু'র একটু সময় লাগে। তারপর সে প্রশ্ন করে, 'সময়ের দ্বার উন্মোচিত করেন মানে? সেটা কীভাবে সম্ভব?'

সামান্য হাসেন কৃষ্ণানন্দ, তারপর বলেন, 'আজ থেকে বহু বছর আগে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের একটি দল এক নতুন মতবাদের জন্ম দেন। তার নাম, কালচক্রযান। তাতে সময়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করার বা রুদ্ধ করার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। তাঁরা তাঁদের সাধনপীঠ স্থাপন করেন হিমালয়ের অতি দুর্গম অঞ্চলে, তার নাম জ্ঞানগঞ্জ। অতি রহস্যাবৃত সেই অঞ্চল, সাধারণ মানুষের অগম্য। একমাত্র গুরু যদি কৃপা করেন, তাঁর বিভূতি দান করেন, তবেই সেই গুপ্ত জ্ঞানগঞ্জ সাধারণ মানুষের গোচরে আসে। তার আরও একটা নাম আছে, তোমরা তাকে সেই নামেই চেনো। শাংগ্রি-লা বা সাম্ভালা।'

'শাংগ্রি-লা?' চমকে ওঠে দেবু, 'কিন্তু এ-সবের সঙ্গে এই বিপদের কী সম্পর্ক কৃষ্ণদা?'

'গভীর সম্পর্ক আছে।' আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখদুটি তুলে দেবুর দিকে তাকান কৃষ্ণানন্দ, 'আচার্য পদ্মসম্ভব সাম্ভালার সম্রাট কালধর্মরাজ সুভদ্র'র সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তিনি লিখেছেন, তিনি সেইদিন ঘোর সাধনসমরে বিজয়ী হন। ক্ষণকালের জন্য সময়ের গহ্বর উন্মুক্ত হয়। তার মধ্যে তিনি নিক্ষেপ করেন সেই অভিশপ্ত প্রেতবস্তুকে, রুদ্ধ করেন তার অপপ্রভাব।

কিন্তু পুঁথিটির শেষে একটি অদ্ভুত কথা লিখেছেন পদ্মসম্ভব। তিনি বলেছেন যে এই ঘটনার ঠিক দেড়হাজার বছর পর বিধির বিধানে সেই একই স্থানে সময়ের দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হবে। সেই অন্ধ প্রেতবস্তু তখন বেরিয়ে আসবে সেখান থেকে, শিকার করে বেড়াবে অযুত অসহায় প্রাণ। তখন তিনি থাকবেন না, এবং তিনি জানেন না তখন কী উপায়ে তাকে নিবৃত্ত করা যাবে।'

'কিন্তু কৃষ্ণদা, এটাই যে সেই জায়গা, আপনি কী করে বুঝলেন?' আকুল হয়ে প্রশ্ন করে দেবু, 'আর এখনই যে সেই দেড় হাজার বছর আগে বলে যাওয়া ঘটনা ঘটছে তার নিশ্চয়তা কী?'

'গণনা, দেবাদিত্য! গণনা!' উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান কৃষ্ণানন্দ, 'পদ্মসম্ভব তাঁর পুঁথিতে সঠিক স্থান নির্ণয়ের হদিশ দিয়ে গেছিলেন। আর বিবৃত করে গেছিলেন সেই রাতটির গ্রহ-নক্ষত্রের বিশদ অবস্থান।

সেই তথ্য অনুসারে আমি জেনেছি যে ঠিক এইখানেই বা এর আশেপাশেই ঘটেছিল সেই অতিজাগতিক ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে আমি এও গণনা করে দেখেছি দেবাদিত্য, দেড় হাজার পর পুনরায় একত্রিত হয়েছে সেইদিনকার নক্ষত্রমণ্ডলী। আজ, এখনই সেই সময়।

আমি স্থির নিশ্চিত, আজ থেকে হাজার বছর আগে এখানেই উন্মুক্ত হয়েছিল কালজঠর। ব্যর্থ হয়নি সেই মহান পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী। গ্রহের ফেরে আজ আবার খুলে গেছে সময়ের দরজা। হাজার বছর পর আবার সেই প্রেতবস্তু বেরিয়েছে তার শৃঙ্খল ছিঁড়ে। সেই একের পর এক শিকার টেনে নিয়ে যাচ্ছে সময়ের গর্ভে।'

সবকিছু ধাঁধার মতো লাগছিল দেবাদিত্যের। বিজ্ঞানের ছাত্র সে। তন্ত্রমন্ত্র-তুকতাকে তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কিন্তু শহর থেকে এত দূরে, এই ঘোর বিপদের মধ্যে, এই তারাভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বোধবুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে গেল তার। স্খলিত স্বরে প্রশ্ন করে সে, 'এর কোনো প্রতিকারের উপায় বলে যাননি সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিক?'

'বিশদে কিছুই বলে যাননি বটে, তবে পুঁথির শেষে একটি অদ্ভুত কথা লিখে গেছেন। তিনি বলেছেন যে এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটিই মাত্র উপায় আছে।'

'কী সেই উপায় কৃষ্ণদা?' আকুলস্বরে প্রশ্ন করে দেবু।

উত্তর না দিয়ে দেবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন কৃষ্ণানন্দ, তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়ান। গম্ভীরমুখে বলেন, 'তুমি যন্তরমন্তরে ফিরে যাও দেবাদিত্য, উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আপনি যাবেন না?' অজানা ভয়ে গলাটা কেঁপে যায় দেবুর।

'না। আমার কাজ আছে। গণনা করে দেখেছি আজই শেষ রাত। আজ রাতের মধ্যে যদি ওদের উদ্ধার করা না হয়, তাহলে চিরকালের জন্য ওরা হারিয়ে যাবে সময়ের গর্ভে। তুমি ফিরে যাও। অধ্যাপক অতি বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই কোনো উপায় বার করে রেখেছেন।'

'আর আপনি? আপনি কিছু করবেন না? ও যে আমার ভাইয়ের মতো কৃষ্ণদা। ওর মায়ের যে ও ছাড়া আর কেউ নেই। আমি কী করে কাকিমার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো? নিজের কাছে কী জবাব দেব?' বলতে-বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে দেবাদিত্য। দু'দিনের সমস্ত জমানো উদ্বেগ যেন ঝরনার জল হয়ে নেমে আসছিল তার দু-চোখ বেয়ে।

দুই পা এগিয়ে দেবুকে বুকে টেনে নেন কৃষ্ণানন্দ, 'এই ভালোবাসার খোঁজই করছিলাম দেবাদিত্য। নগণ্য মানুষ আমি, আমার ক্ষমতা অতি সামান্য। তবুও আজ রাতে আমি এই শ্মশানে সাধনায় বসব। আমার সমস্ত তন্ত্রদীক্ষা নিয়ে আরাধনা করব তাঁর।'

বলতে বলতে দু-হাত ওপরের দিকে তুলে ধরেন কৃষ্ণানন্দ, 'এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ছায়ামাত্র, আপন মায়াজালে যিনি আবৃত করে রেখেছেন এই মহাবিশ্ব, যিনি অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে, আমি আজ শরণ নেব তাঁর। ভয়ের অন্তরালে তিনিই অভয়া, লয়ের মধ্যে তিনিই জয়, মরণের ভিতর তিনিই অমৃতস্বরূপা। তিনি সঙ্গে থাকতে ভয় কীসের?'

'কে তিনি?' সম্মোহিতের মতো প্রশ্ন করল দেবু।

'স্বয়ং মহাকালকে যিনি পদদলিত করেন, মহাকালী।'

খানিক স্তব্ধতার পাহাড় পেরিয়ে প্রশ্ন করল দেবু, 'আপনার দেবী কি প্রসন্ন হবেন? ওরা কি ফিরে আসবে আমাদের কাছে?'

স্মিত ম্লান মুখে সামান্য হাসলেন কৃষ্ণানন্দ, 'সে কথা জানি না ভাই। শুধু এটুকু জানি যে ভালোবাসা ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না। বাকি সমস্ত মন্ত্রতন্ত্র-পূজাপাঠ তাঁর কাছে অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। একমাত্র নিষ্কাম ভক্তি, অপাপবিদ্ধ ভালোবাসাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

বন্ধুর জন্য তোমার এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাটুকু আজ আমি দু-হাত পেতে নিলাম দেবাদিত্য। মায়ের চরণে আজ আমি শুধু সেটুকুই অঞ্জলি দেব।'

বলে কিছুক্ষণ থামলেন কৃষ্ণানন্দ। তারপর ঘনিয়ে আসা সন্ধের দিকে চেয়ে গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণানন্দ, 'পদ্মসম্ভব তাঁর পুঁথির শেষে লিখে গেছেন, এই মহাসঙ্কট থেকে পরিত্রাণের একটিই মহামন্ত্র আছে। তা ছাড়া আর আর কোনও উপায় নেই।'

'কী সেই মন্ত্র কৃষ্ণদা?'

সেই আলোকবিষন্ন সন্ধ্যায় যেন দৈববাণীর মতো ভেসে এল কৃষ্ণানন্দের কণ্ঠস্বর, 'ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় জাদু।'

*

'আঙ্কল! আঙ্কল!'

দেবু'র ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন শঙ্কর গাঙ্গুলি। কন্ট্রোল রুমের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

প্রথমেই তাঁর নজর গেল বাইরের দিকে। সেখানে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। জানলার বাইরে, এই বাড়ির চৌহদ্দি পেরোলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার ওপরে ঝুঁকে এসেছে তারা ভরা নির্মেঘ আকাশ। ডানদিকে তাকালে পাহাড়ের ঢেউ, দূরে দেখা যায় ক্ষীণতোয়া ডায়না নদী।

উঠে দাঁড়ালেন শঙ্কর। কন্ট্রোল রুমের লাগোয়া ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এলেন তিনি। তারপর তিনি, দেবু আর মেজর বক্সি তিনটে চেয়ার টেনে বসলেন।

প্রথম প্রশ্ন করলেন মেজর বক্সি, 'কোনো ক্লু পাওয়া গেল প্রফেসর? সকাল থেকে চিফ বারবার ফোন করছেন। প্রাইম মিনিস্টার নিজেও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।'

'আপনাদের ইনটেলিজেন্স এজেন্সিগুলো কোনো খবর আনতে পারল? মানে এর পেছনে কোনো বৈদেশিক শক্তির ষড়যন্ত্র নেই তো?'

'না প্রফেসর। খুব সম্ভবত এর পেছনে কোন বৈদেশিক শক্তির হাত নেই। পুরো ব্যাপারটাই ইন্টার্নাল। আপনার রিডিং কী বলছে?'

ভ্রূ কুঁচকে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন শঙ্কর। অন্যমনস্কভাবে বললেন 'আমার রিডিংও একই কথা বলছে। মনে হয়, আমি বুঝতে পেরেছি কী ঘটেছিল সেদিন।

এখানে যে যন্ত্রটি আছে, তার মতো পাওয়ারফুল জিনিস জীবনে কমই দেখেছি আমি। এই সাইলেক্ট্রোপ্রোটন যন্ত্রটি এতই শক্তিশালী যে তাতে স্থানীয়ভাবে একটি ছোট আকারের ব্লকড এনার্জি সেন্টার

তৈরি করা সম্ভব। খুব সম্ভবত এখানে সেটাই ঘটেছে। পরীক্ষার ভুলে আচম্বিতে জন্ম নেওয়া ব্লকড এনার্জি সেন্টারটি স্পেসটাইম ফেব্রিকে, মানে স্থান ও কালের নিরবিচ্ছিন্ন চাদরে একটি গহ্বর তৈরি করেছে।

বেশি বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে লাভ নেই। শুধু জেনে রাখুন, ওরা এখানেই আছে, কিন্তু টাইম আর স্পেসের অন্য ডাইমেনশনে।'

'মানে? আপনি কী বলছেন আঙ্কল?' প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে দেবু। মেজর বক্সিও বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে থাকেন শঙ্করের দিকে। শঙ্কর নীচু গলায় ব্যাখ্যা করেন।

'সারাদিন ধরে এর শেষ রেকর্ড হওয়া রিডিংগুলো নিয়ে বসেছিলাম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রতিটা এক্সপেরিমেন্টের একটা প্যাটার্ন আছে। বেশ কয়েকদিন ধরে ধীরে-ধীরে যন্ত্রটার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে মূল এক্সপেরিমেন্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যে এক্সপেরিমেন্টটি হিতেশ করছিল, তার ডেটা-সেট নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষার সময় মেশিনের ক্যালিব্রেশনে কিছু গণ্ডগোল হয়। তাতেই এই দুর্যোগ। ফলে অতি ক্ষুদ্র একটি জায়গায় একটি স্পেসটাইম ফিসার তৈরি হয়, তার মধ্যে দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে হিতেশ আর বাকিরা ওপারে চলে গেছে।'

'সাউন্ডস এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ প্রফেসর।' মেজর বক্সির গলায় সন্দেহের সুর স্পষ্ট হয়, 'এসব তো সায়েন্স ফিকশনে হয় শুনেছি। আপনি শিওর?'

'হ্যাঁ মেজর। আমি নিশ্চিত যে এটাই ঘটেছে।'

'সেক্ষেত্রে তো এই সমস্যার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব।' উত্তেজিত শোনায় মেজরের গলা, 'আমাদের তো তাহলে অন্য লেভেলে মুভ করতে হবে। পিএমও-র পক্ষ থেকে অবশ্য সার্নের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ওঁরা জরুরি ভিত্তিতে একদল উচ্চপর্যায়ের বৈজ্ঞানিক দল পাঠাচ্ছেন। বোধহয় কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁরা...'

'কাল বা পরশু? মাই গুডনেস!' অস্থির হয়ে ওঠেন, শঙ্কর, 'আপনি বুঝতে পারছেন না মেজর, সময় বয়ে যাচ্ছে। যেহেতু হিতেশ আর বাকিরা জীবিত অবস্থায় গেছে ওই জগতে, সেখানকার ইকুইলিব্রিয়াম এখন দ্রুত নষ্ট হতে থাকার কথা। সেক্ষেত্রে সেই সময়ের ওপারের জগত দুটো কাজ করতে পারে। হয় পুরো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, নইলে ওদের জোর করে অন্য কোনো প্যারালাল ওয়ার্ল্ডে পাঠিয়ে দিয়ে আগের অবস্থা রেস্টোর করতে পারে। দুই ক্ষেত্রেই ওদের আর ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

মাথা নীচু করে কী যেন একটা চিন্তা করেন মেজর বক্সি, তারপর বলেন, 'যদি আপনার কথা মেনেও নিই প্রফেসর, তাহলে আমাদের হাতে কতটা সময় আছে?'

'সময় প্রায় নেই বললেই চলে মেজর বক্সি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মুভ করতে হবে।' উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে থাকেন শঙ্কর, 'এই টাইম অ্যান্ড স্পেসের ইকুইলিব্রিয়াম একবার পুরোপুরি নষ্ট হলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে ঠিক তিন দিন লাগে। এর মধ্যে দু'দিনের বেশি সময়ে চলে গেছে। আজ শেষ দিন, এখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। মেশিনটা চালু করে সেই ক্যালিব্রেশন স্ট্যান্ডার্ডে আনতে সময় লাগবে ঘণ্টা চারেক। অর্থাৎ তার পরে আমাদের হাতে আর আধঘণ্টার বেশি সময় নেই।'

'তাহলে?' জানতে চান মেজর, 'আমরা এখন কী করব?'

'এখন একটাই রাস্তা আছে।' দৃঢ় স্বরে জবাব দেন শঙ্কর, 'সেই এক্সপেরিমেন্ট চালু করে এই মেশিনটাকে ফের সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে।'

'তাতে কী হবে?'

'তাতে সেইদিনের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তৈরি হবে গাইড পাথ। সেই পথ ধরে ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'গাইড পাথটা কী জিনিস?'

'সময়ের রাস্তা দু'টি স্পেসটাইম পয়েন্টের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে ঠিকই।' বোঝানোর চেষ্টা করেন শঙ্কর, 'কিন্তু সেই রাস্তাটা পৃথিবীর রাস্তার মতো সোজাসুজি নয়। তার ডিরেকশন ক্রমাগত বদলাতে থাকে। সেটা চেঞ্জ হয় কোয়ান্টাম প্রব্যাবিলিটি অনুযায়ী।

যিনি ওদের গাইড করে নিয়ে আসবেন তাঁকে হতে হবে অঙ্কে তুখোড়। সেখানে কম্পিউটার বা ক্যালকুলেটর নিয়ে যাওয়া যাবে না। বোস-পঁয়কেয়ার থিওরেম মনে-মনে সলভ করতে করতে পথ চলতে হবে, একমাত্র তাহলেই প্রতিটি বদলে যাওয়া বাঁকের হদিস পাওয়া সম্ভব।'

দেবু আর মেজর বিস্মিত হন। পরের প্রশ্নটা দেবুই করে, 'অমন প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ পৃথিবীতে আদৌ কেউ আছেন আঙ্কল?'

'একজনই আছেন দেবাদিত্য। তিনি একইসঙ্গে ফিজিক্স আর ম্যাথস অলিম্পিয়াডে গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। পেয়েছেন গণিতের সর্বোত্তম সম্মান ফিল্ডস মেডেল। যিনি ফার্মা'স লাস্ট থিওরেম সলভ করেছেন।'

'তিনি কে ডক্টর?' সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেন মেজর বক্সি।

'আমি। সে মানুষটি আমি নিজে!'

বিষয়টা দেবু আর মেজর, কারও কাছেই বিশেষ পরিষ্কার হয় না। শেষমেশ দেবুই প্রশ্ন করে, 'তার মানে...আপনি কী বলতে চাইছেন আঙ্কল?'

কাচের জানলার কাছে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকান শঙ্কর। তাঁর শক্ত চোয়ালের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছিল। ওইভাবে দাঁড়িয়েই বলেন তিনি, 'একটাই মাত্র উপায় আছে। ওই এক্সপেরিমেন্ট রিপিট করে সময়ের ওপারে চলে যেতে হবে আমাকে। ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

'অসম্ভব!' এবার মেজর উঠে দাঁড়ান, 'আমি আপনাকে ফের এই বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট করার পারমিশন দিতে পারি না। এর ফলাফল যদি আরও ভয়ঙ্কর হয়? আর তাছাড়া আপনার মতো বৈজ্ঞানিকের জীবন নিয়ে এইরকম ঝুঁকি নেওয়া... না-না! এ জিনিস করা যাবে না।'

'আমার জীবন?' ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ান শঙ্কর, 'আমার জীবনে আর কী আছে মেজর? আমার পরিবার নেই, স্বজন নেই, বন্ধু নেই, দুটো কথা বলার লোক নেই। বিজ্ঞানী সমাজে আমি ব্রাত্য। সুজন আর হিতেশ ছাড়া আমি যে এমনিও বাঁচব না মেজর বক্সি।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল দেবু, কেন এত কাঠখড় পুড়িয়ে ওদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে! ভালোবাসা। প্রবল ভালোবাসা না থাকলে নিজের ওপর এত বড় ঝুঁকি আর কেই বা নেবে? কী যেন বলছিলেন না কৃষ্ণদা? ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় জাদু!

'কিন্তু আঙ্কল, যদি আরও কোনো বড় ক্ষতি হয়?' প্রশ্ন করে দেবু।

'হবে না দেবাদিত্য। আমি কন্ট্রোল করার প্রসেসটা বুঝে নিয়েছি। আমি এই মেশিনটাকে ঠিক সেই ক্যালিবেশনেই সেট করব যাতে মাত্র একজনই পোর্টেড হন।'

মেজর বক্সির দিকে ঘোরেন শঙ্কর, 'পারমিশন? পারমিশন আপনি পেয়ে যাবেন মেজর। আপনারা আসার আগে আমি চিফের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। তিনি আপনাকে ব্রিফ করে দেবেন।'

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'তাহলে মেশিনটা অপারেট করবে কে?'

'ওটা তোমাকেই করতে হবে।' দেবুকে বলেন শঙ্কর, 'তুমি এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্সের স্টুডেন্ট, তোমাকে ছাড়া এই যন্ত্র চালাতে পারে এখানে এমন আর কেউ নেই।

আমি ওই মেশিনের ঘরে থাকব। তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব কী করতে হবে। ভয় পাবে না একদম! খুব কঠিন কিছু নয়। শুধু মাথা ঠান্ডা রেখে, প্যানিকড না হয়ে ক্যালিব্রেটেড পয়েন্টে লিভারটা স্টেডি করে রাখতে

হবে। যা খুশি হয় হোক, দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক হয়ে যাক, সেই পয়েন্ট থেকে সরে আসা চলবে না। মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে দেবু।

আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে দ্রুত হাতে কন্ট্রোল প্যানেল চেক করতে থাকেন শঙ্কর, 'অসুবিধা শুধু একটাই মেজর, আর সেটাই মোক্ষম। ওয়ার্ম হোল তৈরি হওয়ার সময় অনেক অনৈসর্গিক ব্যাপার-স্যাপার ঘটবে। সেটা সাধারণ মানুষের সামনে করাটা বড় রিস্কি হয়ে যাবে। তারজন্যে সেইদিনের মতো ঝড়জলের রাত চাই। অথচ আকাশে এখন একফোঁটা মেঘ নেই...'

ঠিক তখনই কাচের ওপারে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। তিনজনেই চমকে তাকালেন বাইরের দিকে। এক ঝটকায় কাচের স্লাইডিঙের পাল্লা সরিয়ে দিলেন মেজর।

একটু আগের নির্মল আকাশ এখন ঘন মেঘে ঢাকা। হু-হু করে বেড়ে উঠছে মেঘের পর মেঘের স্তূপ। তার সঙ্গে উঠেছে প্রবল ঝড়। একটা তীব্র জোলো হাওয়ার স্রোত যেন তিনজনকে ধাক্কা মেরে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। অন্ধকারের মধ্যেই দেখা গেল, নদীর ধারের গাছগুলো পাগলের মতো মাথা নাড়াচ্ছে। কে যেন চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে তাদের।

'দিস ইজ জাস্ট ইমপসিবল!' চেঁচিয়ে উঠলেন শঙ্কর, 'হাউ অন আর্থ...?'

অসমাপ্তই রয়ে গেল তাঁর কথা। গুমগুম আওয়াজের সঙ্গে একটা বাঁকানো তরবারির আকারের বিদ্যুতের ফলা আকাশের বুকে আছড়ে পড়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জ্বালিয়ে দিল।

চোখ বন্ধ করে ফেলল দেবু। তিনি আসছেন। তিনি শুনেছেন তাদের কথা। কালখড়গ হাতে, মহাঘোর রবে তিনি নেমে আসছেন সময়ের জঠর উন্মুক্ত করতে।

মহাকালী আসছেন!

*

বাতাসের বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। দূরের গাছেদের মাথাগুলো দুলছিল ভয়ানকভাবে। পাগল হয়ে উঠছিল ডায়না নদী। বাতাস বয়ে যাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দে কান পাতা দায়।

তারই মধ্যে সাইলেক্ট্রোপ্রোটনের প্রধান মেশিনটা চালু করে দেবু। কমিউনিকেশন ডিভাইসের ওপর নজর রাখছিল সে। এখনও অবধি তেমন কিছু হয়নি। শঙ্কর গাঙ্গুলি মেশিনরুমের ভেতর আছেন। মেজর বক্সি সহ বাকি কম্যান্ডোরা আপাতত এই এলাকার বাইরে। কাচের দেওয়ালের বাইরে উথাল-পাতাল বাতাস আর ঝোড়ো বৃষ্টি। সেসব পেরিয়ে প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

ঘড়িতে তখন দশটা পনেরো।

দশটা সাতাশ নাগাদ দেবু খেয়াল করে যে কোনো বোধগম্য কারণ ছাড়াই কমিউনিকেশন ডিভাইসগুলোর রিডিং ধীরে ধীরে কমে আসছে। ইলেক্ট্রিগ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ হিট করার প্রাথমিক লক্ষণ এটাই! এরপর ডিভাইসগুলোর রিডিং কমতে-কমতে শূন্য হয়ে যাবে। তারপর নষ্ট হয়ে যাবে এই এলাকার প্রতিটা সময় নির্দেশক যন্ত্রের সেটিং। তখন সময় মাপার জন্য শুধুমাত্র একটা জিনিসই কাজে আসবে দেবুর।

কন্ট্রোলরুমের কোণে রাখা বালিঘড়িটা!

বালিঘড়ি দিয়ে কী করে সময় মাপতে হয় সেটা দেবুকে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর গাঙ্গুলি। এই এক্সপেরিমেন্টের প্রতিটা পদক্ষেপের খুঁটিনাটি ওকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই মতো কয়েকটা সেটিং চেঞ্জ করে দেয় দেবু। এসি-র মধ্যেও কপালে ঘামের ফোঁটা জমতে শুরু করেছিল তার।

রাত দশটা একান্ন।

হঠাৎ করেই থরথর করে কেঁপে ওঠে মেশিনঘর। কন্ট্রোল ডিভাইসের কাছে দৌড়ে যায় দেবু। দ্রুত হাতে কয়েকটা নব ঘোরাতেই একটা চাপা গুমগুম আওয়াজ ভেসে আসে মেশিনঘর থেকে। তারপর একটা অদ্ভুত, বিজাতীয় শব্দে ভরে যায় সারা বাড়িটা। মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি একই সঙ্গে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

শুরু হয়েছে!

শিরদাঁড়া বেয়ে একটা আলাদা উত্তেজনার স্রোত বেয়ে যায় দেবুর শরীরে। কাঁপতে থাকা ঘেমো হাতে মেইন লিভারটা আঁকড়ে ধরে সে। তারপর ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে সেটাকে সর্বোচ্চ বিন্দুর দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

এগারোটা পনেরো।

দ্রুত কমতে থাকে কমিউনিকেশন ডিভাইসের রিডিং। মেশিনের গোঁ-গোঁ শব্দটা বাড়ছে। চোয়াল শক্ত করে লিভারটাকে ক্যালিব্রেটেড পয়েন্টের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে দেবু। আস্তে-আস্তে কাঁপতে শুরু করে ঘরটা। এসি বন্ধ হয়ে যায়। আলোটাও যেন দপদপ করে ওঠে।

এতক্ষণ ধরে অন্য কোনোদিকে দেবুর কোনো নজর ছিল না। বিভিন্ন স্যুইচের নব চেঞ্জ করতে করতে হঠাৎ করে নিজের হাতের দিকে লক্ষ করে সে।

এ কী? তার হাতটা এতো আবছা দেখাচ্ছে কেন?

অবাক হয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকায় দেবু। সবই কেমন ধোঁয়াশার মতো লাগছে না? লিভারের কন্ট্রোল হাতে রেখেই ভীতভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখে দেবাদিত্য।

এই ঘর, দেওয়াল, দরজা, ঘরের সিলিং, ঘরের মধ্যে থাকা ল্যাবের কন্ট্রোল প্যানেল, সবকিছুই যেন সিনেমার ছায়াচিত্রের মতো কাঁপতে-কাঁপতে গলে যেতে শুরু করেছে। প্রবল বর্ষায় জানলার কাচে জমা জলের স্রোত যেভাবে নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, যেভাবেই তার চোখের সামনে গলে পড়ছে এই জগৎ।

যা হচ্ছে হোক, নিজের মুঠো শক্ত করে সে। ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে ওদের, যে কোনো মূল্যে। বাঁ-হাতের চেটো উলটো করে কপালে জমা থাকা ঘাম মুছে ফেলে দেবু।

এগারোটা সাতাশ।

আরও ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে যেন সবকিছু। সাইলেক্ট্রোপ্রোটনের গুমগুম আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে বজ্রপাতের শব্দ। ঘরের আলো নিভে এসেছে প্রায়। বিদ্যুতের ঝলক আছড়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে। যন্ত্রের মতো কন্ট্রোল প্যানেল অপারেট করে চলে দেবু। মাথার মধ্যে এক ম্লান শূন্যতা তার সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে দিচ্ছিল যেন।

এগারোটা ঊনত্রিশ।

থরথর করে কাঁপতে থাকা এই জগতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আবছা হয়ে আসে দেবাদিত্যর। মেশিনঘর থেকে বেরোনো শব্দটা আরও হিংস্র, আরও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, যেন বিশাল কোনো ক্ষুধার্ত নেকড়ে এক্ষুনি ছাড়া পেয়েছে খাঁচা থেকে। তার ক্রুদ্ধ গর্জন দেবুর মগজ অবধি পৌঁছতে পারে না। মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে ও। লিভারটা আর ইঞ্চিখানেক নড়াবার মতো শক্তিও তার শরীরে অবশিষ্ট নেই।

মাথাটা শূন্য হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজের শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে পিকপয়েন্টে লিভারটা ঠেলে দেয় দেবাদিত্য। ঠিক সেই সময় তার চোখের সামনে দুনিয়াটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যায়!

*

পৃথিবী উথালপাতাল করা তাণ্ডবের মধ্যেও নদীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। চারদিকে ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং মহাদেব দামাল হাওয়ার শূল হাতে এই বিশ্ব ধ্বংস করতে নেমে

এসেছেন। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠছিল পাগলের মতো। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছিল বড় বড় পাথর। উপড়ে আসছিল আস্ত গাছ।

ঝোড়ো বাতাস যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল সেই মানুষটিকে। ঝড়ের দাপটে কাপড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। মুখে উড়ে আসছিল খড়কুটো। বৃষ্টির জল তীক্ষ্ন সুঁচের মতো বিঁধছিল তাঁর সর্বাঙ্গে। তবুও সেসব অগ্রাহ্য করে নদীর ওপারে থাকা বাড়িটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর চোখের সামনে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটছিল তখন।

বাড়িটার মাথার ওপর ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছিল একটি অতি বিশাল বৃত্ত চাপ। দেখে মনে হচ্ছিল, অতিলৌকিক কোনও মহাসর্প তার কুণ্ডলীসমেত নেমে আসছে বাড়িটার ওপর। অমোঘ, দুর্লঙঘ্য, অনিবার্য নিয়তির মতো নেমে আসা সেই কালসর্পের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলেন মানুষটি। শ্মশানে অনেক পিশাচসাধনা করেছেন তিনি। অযুতসংখ্যক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। তবুও তাঁর শিরদাঁড়াতে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল এই অতিজাগতিক অনৈসর্গিক দৃশ্যটি।

তাঁর চোখের সামনেই সেই বৃত্তাকার কুণ্ডলীটি নেমে এল বাড়িটার ওপর। তারপর বাড়িটাকে যেন পেঁচিয়ে ধরল সে। বাড়িটা গুঙিয়ে উঠল একবার, তারপর আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল।

হাতদুটো এক বিশেষ মুদ্রায় বদ্ধ করলেন কৃষ্ণানন্দ। তারপর চোখ বন্ধ করলেন। যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

তাদের সামনে ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে থাকা বিশাল গুহামুখটির কোনো অবয়ব, কোনো আকার, কোনো বেধ বা কোনো মাত্রা ছিল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন অন্ধকার সমুদ্রের বুকে সজীব ঘূর্ণি জেগেছে কোথাও। প্রবেশপথটি অদ্ভুতভাবে কাঁপছিল। কেঁচোর মতো একবার সম্প্রসারিত হচ্ছিল সেটি, আরেকবার গুটিয়ে যাচ্ছিল। ক্ষণে-ক্ষণে অবস্থানও বদলে যাচ্ছিল তার।

'আমাদের হাতে সময় আর বেশি নেই বন্ধুরা।' গম্ভীর গলা শোনা যায় শঙ্করের, 'লেটস স্টার্ট। আমি এক-একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি গাইড পাথ ধরে। কিন্তু একজন চলে গেলেই এই গাইড পাথের প্রসারণশীলতা একটু কমে যাবে। আপনারা আপনাদের মনের সমস্ত শক্তিকে সংহত করুন। মনে রাখবেন এই আমাদের শেষ এবং একমাত্র সুযোগ।'

ছায়াগুলো ভিড় করে আসে সেই বদলাতে-থাকা পিণ্ডটির চারিপাশে। দেখে মনে হয়, যেন নিভু-নিভু আলোর পুঞ্জ ঘিরে ধরেছে কোনো আদিম গুহার দ্বার। শঙ্কর একজনকে ইঙ্গিত করেন, তিনি ভেসে এসে দাঁড়ান সেই পিণ্ডটির সামনে। তিনি হাঁউমাউ করে কী একটা বলার চেষ্টা করছিলেন এখানকার স্থানীয় ভাষায়। শঙ্কর হাত তুলে থামতে বলেন তাঁকে, তারপর একবার কী যেন একটা ভাবেন মনে-মনে। তারপর এগিয়ে আসা মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে মিলিয়ে যান পিণ্ডটির মধ্যে।

দু'জনে যাওয়ার একটু পর পিণ্ডটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে যায়। মনে হয় কে যেন একটুখানি প্রাণশক্তি কেড়ে নিয়েছে তার থেকে। সামান্য ধীর হয় তার প্রসারণের ব্যাপ্তি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ফেরেন শঙ্কর। তাঁর প্রভা সামান্য ম্লান দেখাচ্ছিল।

'নিজেদের চিৎশক্তিকে আরও জাগ্রত করুন বন্ধুরা।' শঙ্করের ভাবনা সবার মনে ধাক্কা মারে, 'আমাদের থেকে একজন কমে গেছেন, আমাদের মানসিক শক্তির মোট পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। আমাদের আরও চেষ্টা করতে হবে। যদি বাঁচতে চান তবে আপনাদের সমস্ত চেতনাশক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরে জাগ্রত করুন।'

পরে আরও একজনকে নিয়ে চলে যান শঙ্কর। আরো একটু সঙ্কুচিত হয় পিণ্ডটি। আরও ধীর হয় তার চলন। সবার চেতনাশক্তির ওপর চাপ বাড়তে থাকে।

ছয়জন, তারপর আরও ছয়জন চলে যান শঙ্করকে অনুসরণ করে। ততক্ষণে গাইড পাথটা কাঁপতে শুরু করেছে জ্বরো রুগির মতো। তার প্রবেশপথ ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা ছোট হয়ে এসেছে, আবছায়া হয়ে

এসেছে তার অবয়ব।

সপ্তমবারে যখন ফিরে এলেন শঙ্কর তখন তাঁর স্বর আরও এলোমেলো, আরও বেপথু শোনায়। বোঝা যায়, অসহনীয় মানসিক চাপ ছিঁড়ে ফেলছে তাঁর চিন্তাশক্তির অভেদ্য বর্ম। এখানকার যেসব দেহাতি মানুষজন আটকে পড়েছিলেন, এতক্ষণ ধরে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি। এবার পালা শেষ চারজনের।

'আসুন লেফটেন্যান্ট সাওয়ান্ত!' নিজের স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে-করতে বলেন শঙ্কর, 'আপনাকে ওপারে পৌঁছে দিই।'

'আমি একজন সৈনিক ডক্টর গাঙ্গুলি। আই অ্যাম আ টিমম্যান। আমার কাছে আমার থেকে আমার সঙ্গীদের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান। তাঁদের ফেলে আমি একা চলে যেতে পারি না।'

'এটা বাদানুবাদের সময় নয় লেফটেন্যান্ট।' উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন শঙ্কর, 'তাকিয়ে দেখুন, গাইড পাথ ইতিমধ্যেই ডিসইন্টিগ্রেট করতে শুরু করেছে। আমাদের হাতে আর একদম সময় নেই মেজর। মনে রাখবেন, এখানে আমিই আপনাদের টিম লিডার। ফলো মাই ইন্সট্রাকশনস প্লিজ।'

মেজর মাত্রে, সুজন আর হিতেশ সভয়ে তাকান সেই পিণ্ডটির দিকে। মনে হয় যেন মরণাপন্ন রুগির মতো নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে, তার প্রসারণের গতি অনেক ধীর, অনেক ম্লান। চারপাশের দুঃসহ, অভেদ্য, নিশ্চল অন্ধসমুদ্রের সঙ্গে তার প্রভেদ ক্ষীণ হয়ে এসেছে প্রায়।

লেফটেন্যান্ট সাওয়ান্ত আর দ্বিরুক্তি করলেন না। আরও সঙ্কুচিত হয় পিণ্ডগহ্বর। আগের আকারের প্রায় এক চতুর্থাংশ আকারের হয়ে এসেছে সে। প্রবল মানসিক চাপ এসে পড়ে বাকি তিনজনের ওপর।

সুজন এতক্ষণ ধরে নিজের সমগ্র সত্ত্বা এই সময় জঠরটির জন্যে নিয়োজিত করে রেখেছিল। কিন্তু ঠিক এইখান থেকে তার মানসিক স্থিতি নষ্ট হতে থাকে। তার মাথার মধ্যে আবার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাওয়া শুরু হয়। অতীত থেকে একের পর এক দৃশ্যাবলী আছড়ে পড়তে থাকে তার মনের পর্দায়।

চার বছর বয়স তার। সে আর তার মা দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধরে। তাদের ছেড়ে কে যেন একজন চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে ঘরের দরজা পেরিয়ে, উঠোন ডিঙিয়ে, রাস্তার ওপারে। এক ছোট্ট ছেলের বুকের ভেতর তিলে-তিলে গড়ে ওঠা নরম সাঁকোটা যেন তীব্র আগুনে পুড়িয়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। একবুক অভিমান নিয়ে সেই ছেলেটি তাকিয়ে আছে পুড়ে যাওয়া সাঁকো পেরোনো মানুষটার দিকে।

তার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না তার বাবা?

বহুযুগের ওপার থেকে শতসহস্র দুঃখের গাথা আজ ভিড় করে এল সুজনের স্মৃতির ভেতর। সারা জীবন ধরে বাবার অভাব বোধ করেছে সে। কী দোষ ছিল তার?

একবুক অভিমান তার বুকে উথলে উঠছিল বটে। কিন্তু তার আগেই সুজনের মাথায় গেঁথে যায় অন্য একটা কথা।

যে বাবা তাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন, যাওয়ার সময় পিছন ফিরে তাকাননি অবধি, আজ কিন্তু তিনি নিজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে এসেছেন! ফিরে এসেছেন সময়ের এই অন্ধ গহ্বর থেকে তাদের উদ্ধার করতে। ফিরে এসেছেন তার বাবা। নিজের সন্তানের বিপদ শুনে স্থির থাকতে পারেননি তিনি! এটা ভালোবাসা নয়?

সব গোলমাল হয়ে যায় সুজনের। এতদিন বাদে যে মানুষটা রক্তের টানে সবকিছু বাজি রেখে ফিরে আসতে পারে, তার ভালোবাসার কোনো দাম নেই?

না! বাবাকে আর কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেবে না সে। এবার চলে যেতে চাইলে লোকটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখবে সুজন। অস্তিত্বের সবটুকু নিজের চৈতন্যের মধ্যে সংহত করে ধ্যানস্থ হয় সে। বাঁচতে হবে তাদের। বাঁচতেই হবে।

শঙ্কর যখন ফিরে এলেন তখন অসংলগ্ন বকছেন তিনি, বোঝা যাচ্ছে যে এই বিপুল মানসিক চাপ তিনি আর নিতে পারছেন না। তাঁর চিন্তাভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাঁকে ঘিরে থাকা

আলোকবৃত্ত, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো কাঁপছে সেটি।

'শঙ্কর, এবার একটু বিশ্রাম নে।' বলার চেষ্টা করেন হিতেশ, 'মেন্টাল স্ট্রেনস্থ আর একটু না বাড়লে...!'

'পাগলের মতো কথা বলিস না।' চিৎকার করে ওঠেন শঙ্কর, 'দেখতে পাচ্ছিস গাইড পাথের স্টেবিলিটির অবস্থা? এক্ষুনি ডিসইন্টিগ্রেট করে যাবে। আমাদের হাতে আর সময় নেই। একদম সময় নেই।'

চারজনে মুহূর্তের জন্য তাকান পথটির দিকে। প্রায় আবছা হয়ে এসেছে সে। তার আয়ু শেষ হয়ে এল বলে।

'একটা!' উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন হিতেশ, 'আর মাত্র একটাই এক্সিট বাকি। একসঙ্গে মাত্র তিনজনই যেতে পারবে ওই গাইড পাথ দিয়ে।'

কথা শেষ হয় না হিতেশের। কে যেন শঙ্কর, হিতেশ আর সুজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় প্রায় মুছে আসা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে। তার মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে তিনজনেই শোনেন মেজর মাত্রে'র শেষ কথা, 'জীবনের ঋণ জীবনেই শোধ।'

সঙ্গে-সঙ্গেই বিপুল হাহাকার রব তুলে বন্ধ হয়ে যায় সেই সময়ের দরজা। কালের গর্ভ আবার ডুবে যায় নিরেট নিথর অন্তহীন অনন্তে।

*

দ্রুতস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বাড়িটার দিকে চেয়েছিলেন মানুষটি। ঝড় আর বৃষ্টির বেগ এখন তুঙ্গে। ছোট পাহাড়ি নদীটি যেন পাগল হয়ে উঠেছে। তার ছোবল আছড়ে পড়ছে নদীর বুক জুড়ে পড়ে থাকা পাথরের বোল্ডারগুলোর ওপর।

গুরুগম্ভীর বজ্রগর্ভ মেঘে ছেয়ে গেছে দূর দিগন্ত জুড়ে থাকা পাহাড়ের মাথা। হাওয়ার দাপটে মথিত হয়ে যাচ্ছে এই জগৎ-সংসার। মনে হচ্ছে যেন মহাকালের পাশদণ্ড মহাঘোর রবে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে এই ক্ষুদ্র জনপদ।

প্রবল উদ্বেগ নিজের মধ্যে সংহত করে রেখেছিলেন তিনি। শরীরের সমস্ত পেশি শক্ত হয়ে আছে, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ, কপালে ঘোর ভ্রূকুটি।

তাহলে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁর গুরুর শিক্ষা? তিনি কি আসবেন না? মহাকালের গ্রাস থেকে ওদের উদ্ধার করতে নেমে আসবেন না তিনি?

ভাবতে-ভাবতেই একবার চোখটা বন্ধ করলেন কৃষ্ণানন্দ। তিনি যে শুনেছিলেন যে তাঁকে হৃদমাঝারে রাখলে নাকি এক আশ্চর্য আলো ফুটে ওঠে সাধকের হৃদয়পদ্মে? সে কি মিথ্যে? সে সবই কি তাহলে মিথ্যে?

তারপর চোখ খুলে সামনের দিকে তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি।

ওটা কী! ওটা কী দেখছেন কৃষ্ণানন্দ?

পুরো বাড়িটা ঘিরে মাটি থেকে উঠে আসছে এক ক্ষীণ আলোর স্রোত! সেটা মুড়ে ফেলছে বাড়িটাকে। ঠিক যেভাবে পুরোনো বাড়ির গায়ে গজিয়ে ওঠে আগাছার চারা, সেভাবেই এই আলোর স্রোত ছড়িয়ে পড়ছিল বাড়িটার গায়ে। তফাত একটাই, এখানে প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত দ্রুত। যেন এক তরল আলোর বন্যা অস্বাভাবিক বেগে ছেয়ে ফেলছিল বাড়িটার শরীর।

সেই আলোর স্রোতের রঙ লাল! কালো অন্ধকারের মধ্যে সেই লাল আভার স্রোত দ্রুত বেড়ে উঠছিল, আরও দীপ্যমান হয়ে উঠছিল সেই আলোকবন্যা।

থরথর করে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকলেন কৃষ্ণানন্দ। দু-হাত জড়ো করে মাথায় ঠেকালেন তিনি। ব্যর্থ হয়নি তাঁর পূজা। এসেছেন, তিনি এসেছেন!

মহাকালের সঙ্গে যুঝতে নেমে এসেছেন স্বয়ং মহাকালী!

*

সুজনের মনে হচ্ছিল, যেন সজীব, সচল, প্রাণবন্ত এক গুহার মধ্যে দিয়ে অতি ধীর গতিতে এগোচ্ছে তারা। দুপাশের দেওয়াল ক্রমেই সরে চেপে আসছে তাদের দিকে। সামনে এগোনো মাত্র পেছনের পথ বন্ধ হয়ে নিরেট অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কে যেন কানের কাছে বলে যাচ্ছে, পিছনে ফিরবার রাস্তা নেই! এ পথ শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে জানে।

মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে সামনের প্রায়ান্ধকার পথ। অবশ্য পথ বলা ভুল। একটু ভেসে গেলেই তাদের সামনে জমাট বাঁধছে পাথুরে অন্ধকার। তখনই শঙ্কর থেমে কিছু একটা ভাবছেন মনে-মনে, আর তারপর অন্ধকারের মধ্যে পরের স্পন্দনশীল অংশটি চিহ্নিত করে এগোচ্ছেন।

সুজনের মনে হচ্ছে, অসহ্য চাপে তার সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর বোধহয় শেষরক্ষা হবে না। তার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, শুধু মনের মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে অদ্ভুত সব দৃশ্যাবলী।

উঁচু উঁচু গাছ...জঙ্গল...পাহাড়...পাহাড়ের মাথায় বরফ...পাহাড় থেকে নেমে এসেছে নদী...তার পাশে বনের মধ্যে কাঠের তৈরি কুঁড়েঘর...

কোলে করে কিছু একটা নিয়ে আসছে একটি কিশোর...তার হাতে কী ওটা? হাতটা একটু ফাঁক করে সেই কিশোর...কালো লোমওয়ালা তুলতুলে কী যেন একটা...?

আবার দৃশ্যান্তর হয়। পাহাড়ি নদীর পারে বড়-বড় ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর...তার মধ্যে বাঁকানো শিং আর বড় লোমওয়ালা ইয়াক চরাচ্ছে সেই কিশোর...হঠাৎ খেলার ছলে দৌড়তে থাকে সে...

তার পাশে-পাশে ওটা কী ছুটছে? আরে, এ তো একটা কুকুর! সিংহের মতো কেশরওয়ালা বিরাট একটা কুকুর...টিবেটান ম্যাস্টিফ!

আবার সেই কুঁড়েঘর...প্রবল তুষারপাত...মোটা কম্বলের তলায় শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সেই কিশোর... তাকে জড়িয়ে ধরে আছে কুকুরটা... কী বিশাল, কী রাজসিক তার আকার!

আবার দৃশ্য পালটে যায়। গভীর হাওয়ার এক রাত... অন্ধকার জঙ্গল... কাকে যেন অনুসরণ করতে-করতে উদভ্রান্তের মতো হাঁটছে এক যুবক... হাঁটতে হাঁটতে এক অজানা পাথুরে চাতালে পৌঁছেছে সে... গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে সে... ভয় করছে তার... দূরে অনেকগুলো লোক... একজন বসে আছে... কীসব যেন মন্ত্র পড়ছে সে... ভয় করছে সেই যুবকের... বসে থাকা মানুষটার সামনে কী যেন একটা রাখা... তার ওপর থেকে কাপড় তুলতেই...

আহ! কষ্ট... কী কষ্ট...! মনে হল, কে যেন বুকের ভেতরটা জ্বালিয়ে দিল সুজনের... জ্বলে গেল রে... সবকিছু যেন জ্বলে গেল ওই মানুষটারও... তার বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ... নষ্ট হয়ে গেল সব।

হঠাৎ থেমে যান শঙ্কর। বিড়বিড় করে বলেন, 'লাস্ট স্টেপ, এটাই লাস্ট! ওই, ওই দিকে।'

কিন্তু সেদিকে যে ক্ষীণতম স্পন্দনও নেই! হিতেশ বিমূঢ়ভাবে তাকান শঙ্করের দিকে।

'এ কী! গেট ওপেন হচ্ছে না কেন? ভুল করলাম নাকি? আমি কি ভুল করলাম?' গলা কাঁপতে থাকে শঙ্করের, 'আ-আ-আমি পারছি না! কিচ্ছু পারছি না। মাথা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। আমি বোধহয় আর পারব না। এই ইকোয়েশানটা সলভ করতে পারব না। হল না, আর বোধহয় হল না...!'

গাইড পাথের দেওয়াল প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার মুখে। আর কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। চারদিকের নিশ্ছিদ্র ভয়াল অন্ধকার যেন এই তিনটি প্রাণীর ওপর আরও গভীর, আরও ঘন, আরও গাঢ় হয়ে নেমে আসে।

*

উচ্চৈস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন কৃষ্ণানন্দ। বাড়িটির সর্বাঙ্গ ঘিরে থাকা তরল আলোর প্রভা এখন আরও উজ্জ্বল। বৃত্তচাপ আর বাড়িটার মধ্যে এক দুর্ভেদ্য আবরণ তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছিল সেই পিচ্ছিল আলোর স্রোত পেরিয়ে কিছুতেই যেন বাড়ির দেহ অবধি পৌঁছতে পারছে না সেই সর্বনাশা নাগপাশ।

সেই লাল আলোর স্রোত এবার ধীরে-ধীরে ঘনকৃষ্ণ কালবৃত্তটির গায়ে সর্পিল নাগিনীর মতো উঠে আসতে শুরু করল। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে পর্বতের গা বেয়ে। ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে সেই নাগপাশের দেহ মুড়ে দিতে থাকে রক্তাভ আলোর স্তর।

এবার বাড়ির মাথায় জমে থাকা মেঘের দিকে নজর যায় কৃষ্ণানন্দের। আর তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

বাড়িটার ঠিক মাথার ওপর জমা হওয়া মেঘের পুঞ্জ যেন কার একটা অবয়ব নেওয়ার চেষ্টা করছে। একটা মুখ ফুটে উঠছে না মেঘের বুকে?

একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন কৃষ্ণানন্দ। ওই তো! মুখ, নাক, ঠোঁট, কুঞ্চিত কেশদাম, চোখ...সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

ঠিক তখনই ভয়ঙ্কর দু-চোখে দপ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ।

বিদ্যুতের রঙ লাল!

যেভাবে শিকারি অজগরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিরীহ হরিণশাবক, ঠিক সেভাবেই কৃষ্ণানন্দ সম্মোহিত চোখে তাকিয়ে রইলেন রক্তগর্ভ চোখ দুটির দিকে। ও কার চোখ? ও কার মুখ?

যেন তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতেই ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজ পেরিয়ে একটা খিলখিল অট্টহাসি ভেসে আসে কৃষ্ণানন্দের কানে। সমস্ত চরাচর জুড়ে সেই অট্টহাসি প্রাগৈতিহাসিক নূপুরনিক্কণের মতো বাজতে থাকে তাঁর কানে। সেই হাসির শব্দে ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় তাঁর। অপলক, নির্নিমেষ চোখে তিনি তাকিয়ে থাকেন সেদিকে।

মুখ খুলে যায় সেই অবয়বের। সেখান থেকে একখানি টকটকে লাল মেঘের টুকরো সামান্য বেরিয়ে আসে নীচের দিকে। দেখে মনে হয়, বিশাল রক্তপায়ী লোলজিহ্বা বেরিয়ে এল উন্মুক্ত মুখগহ্বর থেকে।

এবার সেই মেঘপুঞ্জর মধ্যে ফের ঝলসে ওঠে রক্তবিদ্যুৎ। মুহূর্তের মধ্যে সেই লোলজিহ্বা থেকে ছিটকে আসে বিদ্যুতের ফণা। অভিশপ্ত বাড়িটিকে ঘিরে ধরা কালবৃত্তটির ওপর প্রবল আক্রোশে আঘাত হানে চেতনার অতীত কোনো আদিম, প্রাগৈতিহাসিক মহাখড়্গ!

একবার, তারপর আরেকবার, তারপর মুহুর্মুহু, বারংবার। সেই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে ঠকঠক কাঁপতে থাকেন কৃষ্ণানন্দ। ভুল হয়ে যায় তাঁর মন্ত্রপাঠ, শিথিল হয়ে যায় তাঁর মুদ্রাবন্ধন। মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন তিনি। অবাধ শূন্যতা ছাড়া কোনো মন্ত্র, কোনো বিধান, কোনো মুদ্রা, কিছুই সাড়া ফেলে না তাঁর চৈতন্যে।

তিনিও কি তাহলে পারলেন না? শেষ হল না তাহলে তাঁর মন্ত্রসিদ্ধি। হেরে গেলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ?

*

'এরপর?' রুদ্ধকণ্ঠে জানতে চান হিতেশ।

'জানি না, কিচ্ছু বলতে পারছি না।' উন্মত্ত গলায় বলে ওঠেন শঙ্কর, 'আমাদের বোধহয় আর ফেরা হল না। সুজন! সুজন রে...'

সুজনের চেতনার মধ্যে তখন একের পর এক দৃশ্যের অবতারণা ঘটছিল দ্রুত।

পাহাড়ের গা বেয়ে, পাইন, ফার আর বার্চ গাছের ঘন জঙ্গল পেরিয়ে দ্রুত ওপরে উঠছে সে। একটু নীচে কাদের উত্তেজিত গলা শোনা যায়। একবার নীচের দিকে তাকায় সুজন। তারপর আরও দ্রুত উঠতে থাকে ওপরের দিকে। পাহাড়ের ওপারের দেশে পৌঁছতেই হবে তাঁকে।

তার হাতে কালো কাপড়ে জড়ানো কী যেন একটা ঝুলছে। দৌড়তে-দৌড়তে একটা খাদের পাশে দাঁড়ায় সুজন। কান পেতে শোনে, কারও পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না। নিশ্চিন্ত হয়ে এইবার হাতে ধরা কালো কাপড়ের পুঁটুলিতে রাখা গোলমতো জিনিসটা বার করে হাতে নেয় সুজন।

মাথা। একটা কাটা মাথা। একটা কুকুরের লোমশ কাটা মাথা।

অবচেতনে বলে উঠল সুজন, 'শিনজে!'

সুজনকে ধরে একবার জোরে ঝাঁকিয়ে দেন হিতেশ, 'সুজন! কী বলছিস তুই? শিনজে? কে শিনজে? শুনতে পাচ্ছিস সুজন?'

সুজন সাড়া দেয় না। তার আচ্ছন্নবোধের ওপরে আঁচড় কেটে যায় আরও কত ছবি।

একটা ঘর। কার সামনে যেন বসে আছে সে। দুজনের মাঝখানে কাটা মাথাটা। অন্য মানুষটির আয়ত চোখ দু-খানি বিস্ফারিত। সেই কাটা মাথাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তেজিত স্বরে কী যেন বলছেন তিনি।

অন্ধকার রাত... উন্মুক্ত প্রান্তর... তার পাশে নদী... দূরে পাহাড়.... সেখান থেকে নেমে এসেছে ছোট্ট একটি নদী... তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সুজন...সামনে মশাল জ্বলছে...সেই অন্য মানুষটিকে এবার স্পষ্ট দেখতে পায় সে...তাঁর পরনে গেরুয়া পোশাক। তিনি মাটির দিকে নির্দেশ করে কী একটা যেন দেখাচ্ছেন তাকে...মাটিতে কীসব আঁকিবুঁকি কাটা... তার মধ্যিখানে শিনজের কাটা মাথাটা...সে কাঁদছে তাঁর সামনে...কী যেন একটা অনুরোধ করছে...!

হঠাৎ করেই যেন এক আশ্চর্য আলোয় ভরে গেল সেই সচল, সজীব এবং ক্রমেই ক্ষীয়মাণ হয়ে আসা সময়গহ্বর। চমকিত হলেন শঙ্কর, মাথা তুলে তাকালেন তিনি সামনের দিকে।

কোন অলৌকিক মন্ত্রে যেন আবার সচল হয়েছে সেই নিথর অন্ধগুহা! খুলে গেছে গাইড পাথের মুখ। কিন্তু...

তাঁদের সামনে কে যেন দৌড়ে চলেছে। একটু এগিয়ে গিয়ে বারবার ফিরে আসছে সে। যেন তাঁদের বলছে তাকে অনুসরণ করতে। সেই আলোকপুঞ্জের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে সেই কৃষ্ণগহ্বর।

'ওই যে!' পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন শঙ্কর, 'ওই যে এক্সিট! এখখনি বেরোতে হবে এখান থেকে। এটাই শেষ ইকোয়েশন পাথ।'

ধ্যানস্থ সুজনের মাথার ভেতর বিস্ফোরিত হয় আতশবাজির সহস্রধারা স্রোত। সেই গেরুয়াধারী মানুষটি তার মাথায় হাত রাখছেন... বলছেন 'হবে রে থুবতেন, হবে। তোর সঙ্গে শেষবারের মতো সাক্ষাৎ হবে শিনজের, আর তদ্দণ্ডেই উদ্ধার হবে সে। এইখানেই ঘটবে সেই ঘটনা, এই অষ্টভুজক্ষেত্রেই। জীবনমৃত্যুর আবর্তনে আবার জন্ম নিবি তুই। তখন তোর সঙ্গে আবার তার দেখা হবে, হবে, হবে...'

অন্ধের মতো, সম্মোহিতের মতো দু-হাত বাড়িয়ে সুজন এগিয়ে যায় সামনের দিকে, আরও একবার অস্ফুটে বলে, 'শিনজে...শিনজে...তুই এসেছিস?'

চারিদিকে আলোর ফুলকি ছড়িয়ে, সিংহের মতো কেশর দুলিয়ে তার দিকে ছুটে আসে সেই উজ্জ্বল অবয়ব, আর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুজনের বুকে।

নরম আলোর রোশনাইতে জ্বলে যায় সময়ের ছায়াপথ। মহাকালের বুক থেকে ঝরে পড়ে সহস্র হীরকচূর্ণ, যেন জোনাকিদের অযুত উল্লাস ঝাঁক বেঁধেছে ভালোবাসার গহীন গোপন কোটরে, যেন সহস্র দীপাবলির আলোকসজ্জা ঘিরে ধরেছে ভালোবাসার মানুষটিকে। সেই নরম আলোর বিস্ফোরণে চৈতন্য ধাঁধিয়ে যায় হিতেশ আর শঙ্করের।

বোধহয় মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সেই রোশনাই দৌড়ে যায় সামনের দিকে। চিৎকার করে ওঠেন শঙ্কর, 'জাম্প সুজন, জাম্প!...হিতেশ!...হাত ধর আমার...'

তারপর সব স্তব্ধ।

*

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রে সম্মোহিত হয়ে বাড়িটার দিকে চেয়েছিলেন কৃষ্ণানন্দ। একটি অপার্থিব, অলৌকিক দৃশ্য তাঁকে স্থবির করে রেখেছিল।

তিনি দেখছিলেন, বাড়িটার মাথায় জমা হওয়া মেঘের করাল মুখাবয়বটি থেকে ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে বাড়িটার মাথায়। প্রতিটি বজ্রপাতের ক্ষণিকের ঝলকানির মধ্যে বাড়িটা একবার অদৃশ্য হচ্ছে, আবার পরের ঝলকানিতেই দৃশ্য হচ্ছে। আলোর বিস্ফোরণের মধ্যে একবার মনে হচ্ছে, বাড়িটার জায়গায় একটা জমাট বাঁধা শূন্যতা হাঁ করে আছে। পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, কই না তো? ওই তো সেই বাড়ি!

শেষ বজ্রপাতের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিশালায়তন কালবৃত্তটি এক গগনভেদী হাহাকার তুলে দৃশ্যপট থেকে মিশে যেতে থাকে। মিশে যেতে থাকে দু'পাশের জমাট অন্ধকারের মধ্যে। বাড়ির মাথায় জেগে থাকা একটি স্থির রক্তজিহ্বা শুষে নিতে থাকে সেই মহাকালবৃত্তের প্রতিটি গুঁড়ো।

বাড়িটিকে ঘিরে জেগে থাকা রক্তাভ আলোর স্রোত ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে। মাটির বুকে মিশে যেতে থাকে সেই টকটকে রক্ত আলোর বন্যা। তারপর নিভে যায় একেবারে।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন কৃষ্ণানন্দ। কতক্ষণের জন্য, তা জানেন না। তবে যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন ঝড় থেমে গেছে। মৃদুমন্দ জোলো বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর ঘিরে। একটা দুটো করে তারা ফুটছে পরিষ্কার হয়ে আসা আকাশের বুকে। মেঘেদের ঘনঘোর ছায়া সরিয়ে, অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে দাঁড়িয়ে থাকা দূর পর্বতশ্রেণি ছাপিয়ে, এক অনির্বচনীয় শান্তি জেগে উঠছিল কৃষ্ণানন্দের মনে।

এত দূর থেকেও বাড়িটার দিক থেকে ভেসে আসা আনন্দের কান্না আর উল্লাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন মানুষটি। তারপর ধীর ক্লান্ত পায়ে ফেরার রাস্তা ধরলেন।

*

অলৌকিক জ্যোৎস্নার রাত ছিল সেটি। নদীর ধারে উন্মুক্ত পাথুরে জমি ভেসে যাচ্ছে চন্দন-চাঁদের থইথই সুঘ্রাণে। একটু দূরে আরণ্যক দ্রুমদল আকাশের দিকে হাত তুলে আছে, যেন বিশ্বপিতার কাছে সমর্পণ জানাচ্ছে সহজ প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

দুজন মানুষ নদীর পাড়ে একটি বড় পাথরের ওপর বসেছিলেন পটে আঁকা স্থিরচিত্রটির মতো। তাঁদের মধ্যে যিনি নারী, তিনি তাঁর মাথাটি এলিয়ে বসেছিলেন আরেক পুরুষের ছাতিম-সুঠাম বুকে। তাঁর রুপোরঙা চুলের প্রান্ত থেকে চুঁইয়ে পড়ছিল অবিরল ভালোবাসা।

তাঁদের কোলের কাছে গুটিশুটি মেরে শুয়েছিল এক যুবক। এই অবারিত নক্ষত্র-কুড়োনো রাতে তার আর কিছুই চাইবার ছিল না। আশৈশব বিষাদধারা, আজন্ম দুঃখের মেঘরাত পেরিয়ে আজ তার বুকের মধ্যে আশ্চর্য জ্বরের মতো চারিয়ে যাচ্ছিল সদ্যোজাত গহীন সুখের আনন্দভৈরব।

খানিক পরে যুবকটি মৃদুস্বরে ডাকল, 'বাবা।'

স্নেহস্বরে উত্তর ভেসে এলো, 'বল।'

'আমাদের ছেড়ে আর চলে যাবে না তো?'

মানুষটি আর কিছু বললেন না। সামান্য নীচু হয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন যুবকটির মাথায়। বিচ্ছেদের সমস্ত নীল বিষাদ ভেঙে তাঁর বিরহদেহ ছুঁয়ে যাচ্ছিল স্বস্তির অবিরল আনন্দস্রোত।

নারীটি সামান্য নীচু হয়ে চুমু খেলেন যুবকটির মাথায়। তারপর তার মাথাখানি জড়িয়ে নিলেন নিজের বুকে। মাতৃস্নেহের অবিরল স্রোত অশ্রুধারা হয়ে বয়ে যাচ্ছিল তাঁর দু-চোখ বেয়ে। যুবকটির আশৈশবসঞ্চিত মনখারাপের কষদাগ ধুয়ে যাচ্ছিল প্রৌঢ়া মায়ের অযুত কল্যাণচুম্বনে।

প্রৌঢ় পুরুষটি সামান্য নীচু হলেন। তারপর একহাতে তাঁর সন্তান, আরেক হাতে নিজের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে।

স্থির বসেছিলেন তাঁরা। অশ্রুটপটপ নিমফুল ঝরে পড়ছিল তাঁদের ঘিরে। গর্ভিণী ধানের দুধের মতো এক অনাবিল সুখ যেন চারিয়ে যাচ্ছিল তাঁদের তিনজনের গ্রন্থি উপগ্রন্থিতে, শিরায় উপশিরায়।

দূরের জঙ্গলে একটি অশ্বত্থের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলেন আরেকজন মানুষ। তাঁর হৃদয় নরম হয়ে আসছিল এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে। মায়া থরথর নয়নে সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন মানুষটি। তারপর দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'ভালো হোক। যারা ভালোবাসে, তাদের ভালো হোক। ভালো হোক।'

সমাপ্ত